অসম্ভবের দেশে

হেমেন্দ্রকুমার রায়

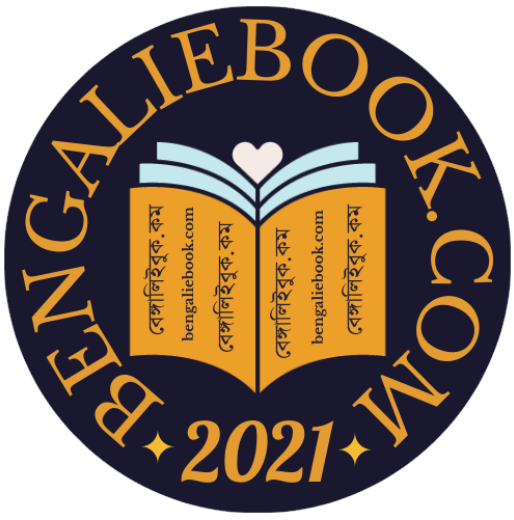

অসম্ভবের দেশে

প্রথম পরিচ্ছেদ । অদ্ভুত জন্তু

সকালবেলায় উঠানের ধারে বসে কুমার তার বন্দুকটা সাফ করছিল। হঠাৎ পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখে, হাসিমুখে বিমল আসছে।

কুমার বিস্মিত স্বরে বললে, এ কি, বিমল যে! তুমি কবে ফিরলে হে?

আজকেই।

তোমার তো এত তাড়াতাড়ি ফেরবার কথা ছিল না।

ছিল না। কিন্তু ফিরতে হল। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছি।

কুমার অধিকতর বিস্ময়ে বললে, আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে! ব্যাপার কী?

গুরুতর। আবার এক ভীষণ নাটকের সূচনা!

কুমার উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তাহলে এ নাটকে তুমি কি আমাকেও অভিনয় করবার জন্যে ডাকতে এসেছ?

তাছাড়া আর কী?

সাধু, সাধু! আমি প্রস্তুত! যাত্রা শুরু হবে কবে?

কালই।

কিন্তু তার আগে ব্যাপারটা একটু খুলে বলবে কি?

তা বলব বইকী! শোনো। তুমি জানো, সুন্দরবনে আমি শিকার করতে গিয়েছিলুম। যে-জায়গাটায় ছিলুম, তার নাম হচ্ছে মোহনপুর। কিন্তু সেখানে গিয়ে শিকারের বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারি না। একটিমাত্র বাঘ পেয়েছিলুম, কিন্তু সেও আমার বুলেট হজম করে হয়তো খোশমেজাজে বহালতবিয়তেই তার বাসায় চলে গিয়েছে।

স্থলচরেরা আমাকে বয়কট করেছে দেখে শেষটা জলচরের দিকে নজর দিলুম। আমার সুনজরে পড়ে একটা কুমির আর একটা ঘড়িয়াল তাদের পশু-জীবন থেকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মুক্তিলাভ করলে! তারপর তারাও আর আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হল না। মনটা রীতিমতো তিক্ত বিরক্ত হয়ে উঠল। ভাবলুম, কাজ নেই বনেজঙ্গলে ঘুরে, ঘরের ছেলে আবার ঘরেই ফেরা যাক!

ঠিক এমনি সময়ে এক অদ্ভুত খবর পাওয়া গেল। মোহনপুর থেকে মাইল-পনেরো তফাতে আছে রাইপুর গ্রাম। রাইপুরের একজন লোক এসে হঠাৎ একদিন খবর দিলে, সেখানকার জঙ্গলে নাকি কি একটা আশ্চর্য জীব এসে হাজির হয়েছে। সে জীবটাকে কেউ বলে বাঘ, কেউ বলে গন্ডার, কেউ-বা বলে অন্যকিছু। যদিও তাকে ভালো করে দেখবার অবসর কেউ পায়নি, তবু এক বিষয়ে সকলেই একমত। আকারে সে নাকি প্রকাণ্ড-যে-কোনও মোষের চেয়েও বড়। তার ভয়ে রাইপুরের লোকেরা রাত্রে ঘুম ভুলে গিয়েছে।

কুমার শুধলো, কেন? সে জীবটা মানুষ-টানুষ বধ করেছে নাকি?

না। সে এখনও মানুষ-টানুষ বধ করতে পারেনি বটে, তবে রাইপুর থেকে প্রতি রাত্রেই অনেক হাঁস, মুরগি, ছাগল আর কুকুর অদৃশ্য হয়েছে। এর মধ্যে আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, সেই অজানা জীবটার কবলে পড়ে রাইপুরের অনেক বেড়াল ভবলীলা সাঙ্গ করেছে বটে, কিন্তু বেড়ালগুলোর দেহ সে ভক্ষণ করেনি।

কুমার বললে, কেন, এর মধ্যে তুমি উল্লেখযোগ্য কী দেখলে?

বিমল বললে, উল্লেখযোগ্য নয়? হাঁস, মুরগি, ছাগল আর কুকুরগুলোর দেহ পাওয়া যায়নি কিন্তু প্রত্যেক বেড়ালেরই মৃতদেহ পাওয়া যায় কেন? সেই অজানা জীবটা আর সব পশুর মাংস খায়, কিন্তু বেড়ালের মাংস খায় না কেন? আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার শোনো। দু-তিনজন মানুষও তার সামনে পড়েছিল। তারা তার গর্জন শুনেই পালিয়ে এসেছে, কিন্তু তাদের আক্রমণ করবার জন্যে সে পিছনে-পিছনে তেড়ে আসেনি।

কুমার কৌতূহল-ভরে বললে, তারপর?

বিমল বললে, তারপর আর কী, এমন একটা কথা শুনে আর কি স্থির হয়ে বসে থাকা যায়! আমিও মোটমাট বেঁধে নিয়ে রাইপুরে যাত্রা করলুম–

কুমার বাধা দিয়ে বলে উঠল, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি সে জীবটাকে দেখে এসেছ?

হ্যাঁ। বনেজঙ্গলে দুই রাত্রি বাস করবার পর তৃতীয় রাত্রে তার সাক্ষাৎ পেলুম। আমি একটা গাছের ওপরে বন্দুক হাতে নিয়ে বসে-বসে ঢুলছিলুম। রাত তখন বারোটা হবে। আকাশে খুব অল্প চাঁদের আলো ছিল, অন্ধকারে ভালো নজর চলে না। চারিদিকের নীরবতার মাঝখানে একটা গাছের তলায় হঠাৎ শুকনো পাতার মড়মড় শব্দ কানে এল। শব্দটা হয়েই থেমে গেল। সেইদিকে তাকিয়ে দেখি, অন্ধকারের ভেতরে ভাটার মতন বড়-বড় দুটো আগুন-চোখ জেগে উঠেছে! সে চোখদুটো আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। চোখদুটো কোন জানোয়ারের আমি বোঝবার চেষ্টা করলুম না, তারপরেই বন্দুকে লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টিপে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে বিষম এক আর্তনাদ ও ছটফটানির শব্দ! সে আর্তনাদ বাঘ-ভাল্লুকের ডাকের মতন নয়, আমার মনে হল যেন এক দানব-বেড়াল আহত হয়ে ভীষণ চিৎকার করছে।

খানিক পরে আর্তনাদ ও ছটফটানির শব্দ ধীরে-ধীরে থেমে এল। কিন্তু আমি সেই রাতের অন্ধকারে গাছের ওপর থেকে আর নামলুম না। গাছের ডালেই হেলান দিয়ে কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে দিলুম। সকালবেলায় চারদিকে লোকজনের সাড়া পেয়ে বুঝলুম, রাত্রে আমার বন্দুকের শব্দ আর এই অজানা জন্তুটার চিৎকার শুনেই এত ভোরে সবাই এখানে

ছুটে এসেছে। আস্তে-আস্তে নীচে নেমে পাশের ঝোপের ভেতরে গিয়েই দেখতে পেলুম, একটা আশ্চর্য ও প্রকাণ্ড জীব সেখানে মরে পড়ে রয়েছে। জন্তুটা যে-কোনও বাঘের চেয়ে বড়। তাকে দেখতে বাঘের মতন হলেও সে মোটেই বাঘ নয়। তার গায়ের রং ধবধবে সাদা, কিন্তু মুখটা কালো। আসলে তাকে একটা অসম্ভবরকম প্রকাণ্ড বেড়াল ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

কুমার সবিস্ময়ে বললে, তুমি বল কি হে বিমল, বাঘের চেয়েও বড় বেড়াল? এও কি সম্ভব?

বিমল বললে, কী যে সম্ভব আর কী যে অসম্ভব তা আমি জানি না। আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি তাই বলছি। কিন্তু এখনও সবকথা শেষ হয়নি।

কুমার বললে, এর ওপরেও তোমার কিছু বলবার আছে নাকি? আচ্ছা, শুনি।

বিমল বললে, বেড়ালটার দেহ পরীক্ষা করতে করতে আর-একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ল। তার গলায় ছিল একটা ইস্পাতের বস আর-একটা ছেঁড়া শিকল। দেখেই বোঝা গেল, এ-বেড়ালটাকে কেউ বেঁধে রেখে দিয়েছিল, কোনগতিকে শিকল ছিঁড়ে এ পালিয়ে এসেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, এমন একটা বিচিত্র বেড়াল এ-অঞ্চলে যদি কারুর বাড়িতে বাঁধা থাকত তাহলে সকলে তার কথা নিশ্চয়ই জানতে পারত। কিন্তু কেউ এই বেড়াল ও তার মালিক সম্বন্ধে কোনও কথাই বলতে পারলে না। এই বেড়ালের কথা লোকের মুখে-মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নানা গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসে তাকে দেখতে লাগল। এমন একটা অসম্ভব জীব দেখে সকলে হতভম্ভ হয়ে গেল।

কুমার বললে, এইখানেই তাহলে তোমার কথা ফুরুল?

বিমল বললে, মোটেই নয়। এইখানেই যদি আমার কথা ফুরিয়ে যেত, তাহলে তোমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি আবার কলকাতায় ফিরে আসতুম না।

কুমার উৎসাহিত ভাবে বললে, বটে-বটে, তাই নাকি?

বিমল বললে, বিকেলবেলায় দূর গ্রাম থেকে রাইপুরে একটা লোক এল, ওই বেড়ালটাকে দেখবার জন্যে। এমনভাবে সে বেড়ালটাকে দেখতে লাগল যাতে করে আমার মনে সন্দেহ হল যে, এই লোকটার এ-সম্বন্ধে কিছু জানা আছে। তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে বললে, সে হচ্ছে মাঝি, নৌকো চালানোই তার জীবিকা। আমি জানতে চাইলুম, এই বেড়ালটাকে সে আগে কখনও দেখেছে কিনা? খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ও কিছু ইতস্তত করে সে বললে, বাবু, এই রাক্ষুসে বেড়ালটাকে আমি আগে কখনও দেখিনি বটে, কিন্তু বোধহয় এর ডাক আমি শুনেছি। তার কথা শুনে আমার কৌতূহল আরও বেড়ে উঠল। তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব কথা জানতে চাইলুম। সে যা বললে তা হচ্ছে এই

দিন-পনেরো আগে একটি বুড়ো ভদ্রলোক আমার নৌকো ভাড়া করতে আসেন। সে বাবুকে আমি আগে কখনও দেখিনি। তাঁর মুখেই শুনলুম, তিনি অন্য একখানা নৌকো করে এখানে এসেছেন, সেই নৌকোর মাঝির সঙ্গে ঝগড়া হওয়াতে সে তাকে আমাদের গ্রামে নামিয়ে দিয়েছিল।

তিনি গঙ্গাসাগরের কাছাকাছি কোনও একটা জায়গায় যেতে চান। যে তাঁকে নিয়ে। যাবে তাকে তিনি রীতিমতো বকশিশ দিয়ে খুশি করবেন, এমন কথাও আমাকে জানালেন। সঙ্গে-সঙ্গে একখানা দশ টাকার নোটও আগাম ভাড়া বলে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। আগাম এতগুলো টাকা পেয়ে আমি তখনই তাঁকে নিয়ে যেতে রাজি হলুম। তার সঙ্গে ছিল মস্তবড় একটা সিন্ধুক, এত বড় সিন্ধুক আমি আর কখনও দেখিনি। আমরা সকলে মিলে ধরাধরি করে সেই সিন্ধুকটাকে নৌকোর ওপরে নিয়ে গিয়ে তুললুম। তোলবার সময় শুনতে পেলুম, সিন্ধুকের ভেতর থেকে কি-একটা জানোয়ার বিকট গর্জন করছে!

আমরা ভয় পাচ্ছি দেখে বাবুটি বললেন, তোমাদের কোনও ভয় নেই, ওর ভেতরে একটা খুব বড়-জাতের বনবেড়াল, আছে! সে যে-কোন জাতের বন-বেড়াল তা বলতে পারি, বনবেড়াল যতই বড় হোক তার চিৎকার এমন ভয়ানক হয়, আমি তা জানতুম না! আমি

বললুম বাবু, এ যদি সিন্ধুক থেকে বেরিয়ে পড়ে, তাহলে আমাদের কোনও বিপদ হবে না তো? তিনি হেসে বললেন, না, সিন্ধুকের ভেতরে ও-বেড়ালটা শিকলে বাঁধা আছে।

কিন্তু নৌকো নিয়ে আমাদের বেশিদূর যেতে হল না। সমুদ্রের কাছে গিয়ে আমরা হঠাৎ এক ঝড়ের মুখে পড়লুম। ঢেউয়ের ধাক্কা থেকে নৌকো বাঁচানোই দায়! দাঁড়িরা সব বেঁকে বসল, বললে-ওই ভারী সিন্ধুকটা নৌকো থেকে নামিয়ে না দিলে কারুকেই আজ প্রাণে বাঁচতে হবে না!

কিন্তু তাদের কথায় সেই বুড়ো ভদ্রলোকটি প্রথমটায় কিছুতেই সায় দিতে চাইলেন না। শেষটা দাঁড়িরা যখন নিতান্তই রুখে উঠল, তখন তিনি নাচার হয়ে বললেন, তোমাদের যা খুশি করো, আমি আর কিছু জানি না!

সকলে মিলে সেই বিষম ভারী সিন্ধুকটা তখনি জলে ফেলে দেওয়ার জোগাড় করলে। কেবল আমি বাধা দিয়ে বললুম, ওর ভেতরে যে বনবেড়ালটা আছে, তার কি হবে? দাঁড়িরা বললে বনবেড়ালটাকে বাইরে বার করলে আমাদের কামড়ে দেবে, তার চেয়ে ওর জলে ডুবে মরাই ভালো!

ভদ্রলোকও ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, না, না, ওকে বাইরে বার করতে হবে না, সিন্ধুক শুদ্ধই ওকে জলে ফেলে দাও!

সিন্ধুকটাকে আমরা তখন জলের ভেতরে ফেলে দিলুম। তার একটু পরেই জলের ভেতর থেকে কি-একটা মস্ত জানোয়ার ভেসে উঠল। সেটা যে কী জানোয়ার, দুর থেকে আমরা ভালো করে বুঝতে পারলুম না-বোঝবার সময়ও ছিল না, কারণ আমরা সবাই তখন নৌকো নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছি।

ঝড়ের মুখ থেকে অনেক কষ্টে নৌকোকে বাঁচিয়ে, সন্ধ্যার সময় আমরা সমুদ্রের মুখে মাতলা নদীর মোহনায় গিয়ে পড়লুম। দুরে একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছিল, আঙুল দিয়ে সেইটে

দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আমাকে তোমরা ওইখানে নামিয়ে দাও। আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, এই অসময়ে ওই দ্বীপে নেমে আপনি কোথায় যাবেন?

ভদ্রলোক একটু বিরক্ত ভাবেই বললেন, সে কথায় তোমাদের দরকার নেই, যা বলছি শোনো। আমরা আর কিছু না বলে নৌকো বেয়ে দ্বীপের কাছে গিয়ে পড়লুম। তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে দ্বীপের বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে আর নজর চলে না।

এ-দ্বীপে আমরা কখনও আসিনি, এখানে যে-কোনও মানুষ থাকতে পারে তাও আমাদের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বুড়ো ভদ্রলোকটি অনায়াসেই নৌকো থেকে নেমে সেই অন্ধকারের ভেতরে কোথায় মিলিয়ে গেলেন।

তখন ভাটা আরম্ভ হয়েছে। নৌকো নিয়ে আর ফেরবার চেষ্টা না করে সে-রাতটা আমরা সেইখানেই থাকব স্থির করলুম। নৌকো বাঁধবার চেষ্টা করছি, এমন সময় অন্ধকারের ভেতর থেকে সেই ভদ্রলোকের গলায় শুনলুম-তোমরা এখানে নৌকো বেঁধো না, শিগগির পালিয়ে যাও, নইলে বিপদে পড়বে!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, এখানে থাকলে বিপদ হবে কেন বাবু?

ভদ্রলোক খুব কড়া গলায় বললেন, আমার কথা যদি না শোনো, তাহলে তোমরা কেউ আর প্রাণে বাঁচবে না।

তবুও আমি বললুম, বাবু, সারাদিন খাটুনির পর এই ভাটা ঠেলে আমরা নৌকো বেয়ে যাই কি করে? এখানে কিসের ভয়, বলুন না আপনি? বুনো জন্তুর, না ডাকাতের?

ভদ্রলোক বললেন, জন্তুও নয়, ডাকাতও নয়, এ-দ্বীপে যারা আছে তাদের দেখলেই ভয়ে তোমাদের প্রাণ বেরিয়ে যাবে! শিগগির সরে পড়। আমি আর একবার জিজ্ঞাসা করলুম, তবে এমন ভয়ানক জায়গায় আপনি নামলেন কেন?

ভদ্রলোক হা-হা-হা-হা করে হেসেই চুপ করলেন, তারপর তার আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। আমাদেরও মনে কেমন একটা ভয় জেগে উঠল, সেখান থেকে তখুনি নৌকো চালিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলুম।

বাবু, আমার বিশ্বাস, আপনি এই যে রাক্ষুসে বেড়ালটাকে মেরেছেন, সেই সিন্ধুকের ভেতরে এইটেই ছিল।

.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । নূতনত্ব কী?

বিমলের গল্প শেষ হলে পর কুমার খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর ধীরে-ধীরে বললে, সেই বুড়ো লোকটি যে কে, সে-কথা তুমি জানতে পেরেছ কি?

তাই জানবার জন্যেই তো আমার এত আগ্রহ! তবে মাঝির মুখে শুনেছি, লোকটি নাকি বাঙালি, আর বুড়ো হলেও তিনি খুব লম্বাচওড়া জোয়ান। আর তাঁর মেজাজ বড় কড়া।

কিন্তু বিমল, সে দ্বীপে এমন কী থাকতে পারে? বৃদ্ধ কি মিছামিছি ভয় দেখিয়েছেন? দ্বীপে ভয়ের কিছু থাকলে তিনি একলা সেখানে নামবেন কেন?

কুমার, তুমি আমায় যে প্রশ্নগুলি করলে, আমারও মনে ঠিক ওইসব প্রশ্নই জাগছে! ওইসব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়ার জন্যেই আমরা সেই দ্বীপের দিকে যাত্রা করব।

কিন্তু আগে থাকতে তবু কিছু ভেবে দেখা দরকার তো? বৃদ্ধ বলেছেন, সে দ্বীপে যারা আছে তারা জন্তু নয়, ডাকাতও নয়। তবে তারা কে? মানুষ তাদের দেখলে ভয় পেতে পারে। তবে কি তারা ভূত? তাই বা বিশ্বাস করি কেমন করে? ভূত-প্রেত তো কবির কল্পনা, খোকা-খুকিদের ভয় দেখিয়ে শান্ত করবার উপায়।

না কুমার, ভূত-টুত আমিও মানি না, আর বৃদ্ধ যে ভূতের ভয় দেখিয়েছেন তাও আমার মনে হয় না।

তবে?

কিছুই বুঝতে পারছি না। অবশ্য সেই দ্বীপে যদি এইরকম দানব-বেড়ালের আত্মীয়রা থাকে তাহলে সেটা বিশেষ ভয়ের কথা হবে বটে। কিন্তু বৃদ্ধ জন্তুর ভয় দেখাননি।

কুমার কিছুক্ষণ ভেবে বললে, দ্যাখো, আমার বোধহয় সেই বৃদ্ধ মিথ্যা কথাই বলেছেন। দ্বীপের ভেতর হয়তো কোনও অজানা রহস্য আছে। অন্য কেউ সে কথা টের পায়, হয়তো বৃদ্ধ তা পছন্দ করেন না। হয়তো সেইজন্যেই তিনি দাঁড়ি-মাঝিদের মিথ্যে ভয় দেখিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

বিমল বললে, কিন্তু সে রহস্যটা কী? যে দ্বীপে এমন দানব-বেড়াল পাওয়া যায় সে দ্বীপ যে রহস্যময় তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানে এমন অসম্ভব বেড়ালের চেয়েও অসম্ভব আরও কোনও রহস্য আছে কি না সেইটেই আমি জানতে চাই।

কুমার বললে, মঙ্গলগ্রহে, ময়নামতীর মায়াকাননে, আসাম আর আফ্রিকার বনেজঙ্গলে, সুন্দরবনে অমাবস্যার রাতে আর হিমালয়ের দানবপুরীতে অনেক অসম্ভব রহস্যই আমরা দেখলুম! তার চেয়েও বেশি অসম্ভব কোনও রহস্য যে আর ত্রিজগতে থাকতে পারে একথা আমার বিশ্বাস হয় না। প্রেতলোক যদি সম্ভবপর হত, তাহলেও বরং নতুন কিছু দেখবার সম্ভাবনা ছিল! কিন্তু প্রেত যখন মানি না তখন নতুন কিছু দেখবার আশাও রাখি না।

বিমল মাথা নেড়ে বললে, না কুমার, ত্রিজগতে নূতনত্বের অভাব কোনওদিনই হয়নি। ধরো ওই চন্দ্রলোক! ওর আগাগোড়াই তুষারে ঢাকা, ওকে তুষারের এক বিরাট মরুভূমি বললেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ পণ্ডিতেরা বলেন ওর ভেতরেও নাকি জীবের অস্তিত্ব আছে। তাদের মতে সে-সব জীব মোটেই মানুষের মতো দেখতে নয়, তাদের দেখলে হয়তো আমরা নতুন কোনও জন্তু বলেই মনে করব, যদিও মস্তিষ্কের শক্তিতে হয়তো

মানুষেরও চেয়ে তারা উন্নত। হয়তো তারা বাস করে তুষার মরুভূমির পাতালের তলায়, যেখানে গেলে আমাদেরও তারা নতুন কোনও জন্তু বলেই সন্দেহ করবে! তুমি কি বলতে চাও কুমার, সেখানে গেলে তুমি এক নতুন জগৎ দেখবার সুযোগ পাবে না?

কুমার বললে, কিন্তু আপাতত চন্দ্রলোকের কথা তো হচ্ছে না, আমরা থাকব এই পায়ে-চলা মাটির পৃথিবীতেই! সুন্দরবনের প্রান্তে, গঙ্গাসাগরের কাছে ছোট্ট এক দ্বীপ, কলকাতা থেকে সে আর কত দূরই বা হবে? সেখানে যে বিশেষ কোনও নতুনত্ব আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে আমি তা বিশ্বাস করি না।

বিমল মাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, দ্যাখো কুমার, একসার পিঁপড়ে খাবার মুখে করে কোথায় যাচ্ছে!

কুমার বললে, ওই যে, চৌকাঠের তলায় ওই গর্তের ভেতরে গিয়ে ওরা ঢুকছে।

হুঁ। এটা তোমার নিজের বাড়ি, এখানকার প্রতি ধূলিকণাটিকেও তুমি চেনো। কিন্তু তোমারই ঘরের দরজার তলায় পিঁপড়েদের যে উপনিবেশ আছে, তার কথা তুমি কিছু বলতে পারো?

তুচ্ছ প্রাণী পিঁপড়ে, তার সন্ধান আবার রাখব কি?

তুচ্ছ প্রাণী পিঁপড়ে, কিন্তু এবার থেকে তাদেরও সন্ধান রাখবার চেষ্টা কোরো। মানুষের তুলনায় তাদের মস্তিষ্ক হয়তো ওজনে বেশি হবে না; কিন্তু সন্ধান রাখলে জানতে পারবে, মানুষের সমাজের চেয়ে পিঁপড়ের সমাজ অনেক বিষয়েই উন্নত। পৃথিবীতে কর্তব্যে অবহেলা করে এমন মানুষের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু লক্ষ-লক্ষ পিঁপড়ের ভেতরে এমন একটি পিঁপড়েও তুমি পাবে না, নিজের কর্তব্যে যার মন নেই। যার যা করবার নিজের ইচ্ছাতেই সে তা অশ্রান্তভাবে করে যাচ্ছে। পিঁপড়দের দেশে অবাধ্য ছেলেমেয়ে একটিও নেই। তাদের যে রানি সেও এক মুহূর্ত অলস হয়ে বসে থাকে না, অষ্টপ্রহরই ডিমপ্রসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকে। একদল পিঁপড়ে সর্বদাই করছে রানির সেবা-যত্ন, একদল করছে

একমনে ডিম আর বাচ্চাদের পরিচর্যা, আর একটা বৃহৎ দলের কাজ খালি বাহির থেকে রসদ বহন করে আনা। এদের উপনিবেশের ভেতরটা পরীক্ষা করার সুযোগ পেলে অতি বড় বুদ্ধিমান মানুষও অবাক হয়ে যাবে। তার ভেতরে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা আছে, রসদখানা আছে, ডিম রাখবার আলাদা মহল আছে, এমনকী পিঁপড়েদের উপযোগী সবজি বাগান পর্যন্ত আছে। কুমার, তুমি বোধহয় জানো না যে, পিঁপড়েরাও গাভী পালন করে। অবশ্য সে গাভীকে, দেখতে আমাদের গাভীর মতো নয়, কিন্তু তারা দুগ্ধদান করবে বলেই তাদের পালন করা হয়।

কুমার সবিস্ময়ে বললে, বলো কী বিমল, এ-সব কথা যে আমার কাছে একেবারে নতুন বলে মনে হচ্ছে!

অথচ এই পিঁপড়েদের উপনিবেশ তোমার ঠিক পায়ের তলাতেই! পৃথিবীতে তুমি নতুনত্বের অভাব বোধ করছ, কিন্তু নিজের পায়ের তলায় কি আছে তার খবর তুমি রাখ না! কেবল তুমি নও, অধিকাংশ মানুষেরই স্বভাব হচ্ছে এইরকম। যাদের জানবার আগ্রহ আছে, জ্ঞানলাভের প্রবৃত্তি আছে, আর দেখবার মতো চোখ আছে, জীবনে তাদের কোনওদিনই নতুনত্বের অভাব হয় না।

কুমার অপ্রতিভ ভাবে বললে, মাফ করো ভাই বিমল, আমারই ভ্রম হয়েছে। কিন্তু এখন আসল কথাই হোক। নতুনত্ব খুঁজে পাই আর না পাই, তোমার সঙ্গে থাকার চেয়ে আনন্দ আমার আর কিছুই নেই। তাহলে কবে আমরা যাত্রা করব?

বিমল বললে, যে মাঝির কাছে থেকে সেই দ্বীপ আর সেই দ্বীপবাসীর খবর পেয়েছি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে সেই-ই। আমার যে মোটরবোট আছে, তাইতে চড়েই আমরা কলকাতা থেকে যাত্রা করব। রাইপুর থেকে মাঝি তার নৌকো নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে। সে প্রথমটা কিছুতেই রাজি হয়নি, টাকার লোভ দেখিয়ে অনেক কষ্টে শেষটা তাকে আমি রাজি করাতে পেয়েছি। মাঝি তার নৌকো আর লোকজন নিয়ে রাইপুরেই

প্রস্তুত হয়ে আছে, তোমার যদি অসুবিধে না হয়, তাহলে কালকেই আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি।

কুমার বললে, আমার আবার অসুবিধে কি? কালকেই আমি যেতে পারি।

.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পুনরাবির্ভব

মাঝির নাম ছিল কাসিম মিয়া। রাইপুরের ঘাটে মোটরবোট ভিড়িয়ে বিমল ও কুমার তার দেখা পেলে।

বিমলকে মোটরযোট ছেড়ে ডাঙায় নামতে দেখে সেও তাড়াতাড়ি জাল-বোনা রেখে নিজের নৌকো থেকে নেমে এল।

বিমল তাকে দেখে শুধোলে, কি মিয়া সায়েব, তোমরা সব তৈরি আছ তো?

কাসিম সেলাম ঠুকে বললে, হা হুজুর, আমরা সবাই তৈরি। আজকে বলেন, আজকেই যেতে পারি।

তোমার সঙ্গে ক-জন লোক নিয়েছ?

চারজন দাঁড়ি নিয়েছি হুজুর!

কিন্তু এ-যাত্রা দাঁড় বোধহয় তাদের কারুকেই টানতে হবে না! আমাদের বোটই তোমাদের পানসিকে টেনে নিয়ে যাবে। তোমরা খাবে-দাবে আর মজা করে ঘুমোবে।

কাসিম একটুখানি হাসবার চেষ্টা করে বললে, ঘুমোতে কি আর পারব হুজুর? আমার লোকেরা ভারী ভয় পেয়েছে।

বিমল আশ্চর্য স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, ভয় পেয়েছে? কেন?

কাসিম কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে বললে, তাদের বিশ্বাস, যেখানে আমরা যাচ্ছি সেখানে গেলে মানুষ আর ফিরে আসে না! অছিমুদ্দি মাঝির মুখে তারা শুনেছে, ও-দ্বীপে নাকি ভূত-প্রেত দৈত্য দানোরা বাস করে। সেই দ্বীপের কাছে গিয়ে তিন-চারখানা নৌকো নাকি আর ফিরে আসেনি। নৌকোর যারা ছিল তারা কোথায় গেল, তাও কেউ জানে না। জল-ঝড় নেই, অথচ মাঝে মাঝে ওখানে নাকি অনেকবার নৌকোডুবি হয়েছে! পেটের দায়ে নৌকো চালিয়ে খাই, আপনি ডবল ভাড়া আর তার ওপরে বখশিশের লোভ দেখালেন বলেই আপনাকে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছি। কিন্তু আগে অছিমুদ্দির কথা শুনলে আমরা এ কাজে বোধহয় হাত দিতুম না।

বিমল তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, তুমি এমন জোয়ান-মদ্দ কাসিম মিয়া, তুমিই শেষটা ভয় পেয়ে গেলে নাকি?

কাসিম বললে, একেবারে ভয় পাইনি বললে মিথ্যে বলা হয় হুজুর! দ্বীপের সেই বুড়ো বাবুটিও তো আমাদের ভয় দেখাতে কসুর করেননি! কেন তিনি আমাদের সেখানে রাত কাটাতে মানা করলেন? কেন তিনি বললেন, সেখানে জন্তুর ভয় নয়, ডাকাতের ভয় নয়, অন্যকিছুর ভয় আছে? অন্য কিসের ভয় থাকতে পারে? আমরা ভেবেচিন্তে কোনও হদিস খুঁজে পাচ্ছি না!

বিমল বললে, অত হদিস খোঁজবার দরকার কী মিয়া সায়েব? একটা কথাই খালি ভেবে দেখো না? সেই বুড়োবাবুটি তো মানুষ, সেখানে যদি অন্যকিছুর ভয় থাকত, তাহলে কি তিনি নিজে সেই দ্বীপে নামতে সাহস করতেন? অত বাজে ভাবনা ভেব না, সেই দ্বীপে হয়তো এমন কিছু আছে, বুড়োবাবুটি যা অন্য লোককে জানতে দিতে রাজি নন। তাই তিনি তোমাদের মিথ্যে ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছেন!

কাসিম বললে, সেখানে অন্য কিছু কি আর থাকতে পারে?

ধরো, হয়তো সেই দ্বীপে গুপ্তধন আছে, আর বুড়ো বাবুটি কোনওরকমে তা জানতে পেরেছেন।

গুপ্তধনের নামেই কাসিমের সারা মুখ সাগ্রহ কৌতূহলে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল! কিন্তু তার পরেই সে আবার নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে বললে, আপনি যা বলছেন তা অসম্ভব নয় বটে! কিন্তু রাক্ষুসে বেড়ালের মতো দেখতে সেই ভূতুড়ে জানোয়ারটার কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন? সেই জানোয়ারটা কোত্থেকে এল? সেই দ্বীপ থেকেই তো?

বিমল বললে, জানোয়ারটা যে সেই দ্বীপ থেকেই এসেছে এমন কথা জোর করে কিছুতেই বলা যায় না! তোমার নৌকোর সিন্ধুকের ভেতরে যে সেই জানোয়ারটাই ছিল এটা তো তুমি আর স্বচক্ষে দেখোনি, আন্দাজ করছ মাত্র। তারপর ধরো, জানোয়ারটা না হয় সেই সিন্ধুকের ভেতরেই ছিল! কিন্তু বুড়োবাবুটি তাকে নিয়ে হয়তো সেই দ্বীপ থেকে আসছিলেন না, দ্বীপের দিকেই যাচ্ছিলেন। হয়তো তিনি অন্য কোনও জায়গা থেকে সেই জানোয়ারটাকে ধরে এনেছিলেন। এতবড় এই সুন্দরবন, এর ভেতরে কোথায় কত অজানা জানোয়ার আছে, তার খোঁজ কি তোমরা রাখো?

কাসিম যেন অনেকটা আশ্বস্ত হল। সে বললে, আর একটা নতুন খবর আছে হুজুর! সেই বুড়ো বাবুটি আবার এখানে এসেছিলেন!

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, তাই নাকি! তারপর?

আপনি যেদিন মোহনপুর থেকে চলে যান, ঠিক তার পরের দিনই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাকে দেখেই তিনি চিনতে পারলেন। তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে বললেন, কাসিম, তোমাদের এ অঞ্চলে নাকি কী একটা আশ্চর্য জানোয়ার এসে উৎপাত করছে? আমি বললুম, হ্যাঁ হুজুর, একটা জানোয়ার এসে এখানে উৎপাত করছিল, বটে, কিন্তু কলকাতায় এক বাবু এসে বন্দুক ছুঁড়ে তার লীলাখেলা সাঙ্গ করে দিয়েছেন! শুনেই রাগে তাঁর সারা। মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল, আর কোনও কথা না বলে হনহন করে তিনি একদিকে চলে গেলেন।

বিমল ব্যস্ত ভাবে বললে, কাসিম, আমরা যে সেই দ্বীপে যাব সে কথা তাঁকে তুমি বলোনি তো?

কাসিম বললে, আজ্ঞে না হুজুর, বলবার সময়ই পাইনি!

বিমল হাঁপ ছেড়ে বললে, সেই বাবুটি এখনও এখানে আছেন নাকি?

কাসিম বললে, বোধহয় নেই। কোথায় যে তিনি গেলেন, তারপর থেকে আমরা কেউ আর তাঁকে দেখতে পাইনি।

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, বাবুটিকে কেমন দেখতে বলো দেখি? কাসিম বললে, বলেছি তো, খুব লম্বাচওড়া জোয়ান লোক। তার বয়েস ষাট বছরের কম হবে না, কিন্তু তাঁকে দেখলেই বোঝা যায় এখনও তার গায়ে অসুরের মতো জোর আছে। তার রং শ্যামলা, মাথায় লম্বা সাদা চুল আর মুখে লম্বা-লম্বা সাদা দাড়ি। নাকে ধোঁয়া-রঙের চশমা, সেই চশমার ভেতর থেকে মাঝে-মাঝে মনে হয় তার চোখদুটো যেন দপদপ করে জ্বলছে!

বিমল খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, কাসিম, আমার মোটগুলো বোট থেকে নামিয়ে তোমাদের পানসিতে তুলে নাও। আজ বিকালেই আমরা নৌকো ছাড়ব।

.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। জ্যোৎস্নাময় জঙ্গলে

পূর্ণিমা রাত। নির্মেঘ নীল আকাশে তারাদের সভা বসেছে আর তারই ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে ভরা জোছনার জোয়ার।

পৃথিবীতেও দুই ধারে যেন পরির হাতে সাজানো নীলবনের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে। কানায় কানায় ভরা নদীর জোয়ারের জল। সে-জলস্রোতকে মনে হচ্ছে রুপোলি জোছনার স্রোত।

নির্জনতা যে কত সুন্দর মায়াময় হতে পারে শহরে বসে কেউ তা অনুভব করতে পারে না।

বনে-বনে গাছের ডালে-ডালে সবুজ পাতা-শিশুরা খেলা করছে আলো-ছায়ার ঝিলিমিলি দুলিয়ে-দুলিয়ে এবং নদীর বুকে-বুকে ঢেউ-শিশুরা খেলা করছে হিরে ধারার জাল বুনতে-বুনতে।

এক-একবার ঠান্ডা বাতাসের উচ্ছ্বাস ভেসে আসছে-আর সঙ্গে-সঙ্গে ঢেউ-শিশু আর পাতা-শিশুরা খুশির হাসিতে চারিদিকের নীরবতা অস্ফুট, অপূর্ব শব্দময় করে তুলছে।

কিন্তু এই বনভূমির মৌনব্রত ভঙ্গ করেছে অনেক ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি। চাঁদের আলোর যে একটি নিজস্ব শান্ত সুর আছে, যা এই নির্জন বনভূমিকে মোহনীয় করে তুলেছে, ওইসব ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তার অনেকখানি সৌন্দর্য নষ্ট করে দিচ্ছে।

বিমলদের মোটরবোটের যন্ত্রের গর্জন এই নিরালায় কী কর্কশ শোনায়!

সেই গর্জন শুনে মাঝে-মাঝে চরের ওপর থেকে জীবন্ত ও ভয়াবহ গাছের গুঁড়ির মতো কিকতকগুলো জলের ওপর সশব্দে আঁপিয়ে পড়ে চারিদিক তোলপাড় করে তোলে।

কাসিম বলে ওঠে, হুজুর, কুমির!

বিমল ও কুমার তা জানে। জলবাসী ওই করাল মৃত্যুর শব্দ তারা আরও অনেকবার শুনেছে।

এক জায়গায় চার-পাঁচটি হরিণ জলপান করছে। কাছেই অরণ্যের অন্তঃপুরে বাঘের ঘন ঘন হুঙ্কার জেগে উঠল, সঙ্গে-সঙ্গে থেমে গেল ভীত মৃগদের জলপান করার শব্দ।

অরণ্যের মধ্যে দিনে যারা ঘুমায়, সদলবলে জেগে উঠেছে তারা আজ রাত্রে! লক্ষ লক্ষ কীটপতঙ্গ। জ্যোৎস্নার মুখে কালো অভিশাপের মতো দলে-দলে বাদুড় ও কালো পেচক!

কোথাও গাছের ভেতর থেকে ভীরু পাখির দল আর্তনাদ করে উঠল, হয়তো তাদের বাসার ভেতরে এসেছে বিপদজনক কোনও অতিথি।

থেকে-থেকে অদ্ভুত ভূতুড়ে স্বরে ডেকে উঠছে তক্ষকের দল। কোনও গাছের টঙ থেকে যেন একদল অশরীরী ও অমানুষ নরশিশু ককিয়ে কেঁদে উঠল, তারা হচ্ছে বকের ছানা। মাঝে-মাঝে অস্বাভাবিক স্বরে ব্যাঙ চিৎকার করে উঠছে-এ আর কিছু নয়, সর্পের কবলগত হয়ে হতভাগ্যের প্রবল অথচ ব্যর্থ প্রতিবাদ!

এই চন্দ্রকিরণের রাজ্য দিয়ে, এই বনস্পতিদের তপোবন দিয়ে, এই ধ্বনি-প্রতিধ্বনির জগৎ দিয়ে, জলের বুকে ফেনার আলপনা কাটতে কাটতে তীব্র গতির বেগে উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছে বিমলদের মোটরবোট।

চারিদিকের দৃশ্য দেখতে-দেখতে, চারিদিকের শব্দ শুনতে-শুনতে বিমল হঠাৎ বলে উঠল, শোনো কুমার, কান পেতে শোনো! মহাকাল এই নির্জন অরণ্যে একলা বসে জীবন-সংগ্রামের অনন্ত ইতিহাস নিজের মনেই উচ্চস্বরে পাঠ করে যাচ্ছেন! কবিরা বনে এসে বিজনতা আর নীরবতার সন্ধান পান। কিন্তু এই মিষ্ট চাঁদের আলোয়, এই অরণ্যের অন্তঃপুরে এসে, তুমি কি মৃত্যুর নিষ্ঠুর রথচক্রের ধ্বনি নিজের কানে শুনতে পাচ্ছ না? এ বন নির্জন বটে, কিন্তু এখানকার অন্ধকারের অন্তরালে বসে কত কোটি কোটি কীটপতঙ্গ আর জীবজন্তু জীবনযুদ্ধের চিরন্তন নিষ্ঠুরতায় অশ্রান্ত আর্তনাদ করছে-কত দুর্বল কত সবলের কবলে পড়ে অত্যাচারিত হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে কত সহস্র জীবনের প্রাণ নষ্ট হচ্ছে। আমরা মানুষ, আমরা হচ্ছি নগরবাসী সামাজিক জীব, প্রতিপদে আমাদেরও আত্মরক্ষা করতে হয় বটে, কিন্তু সে হচ্ছে অন্য নানান কারণে। জীবনের ভয় যে সেখানে নেই এমন কথা বলি না, কিন্তু এখানকার তুলনায় সেখানকার নীতি হচ্ছে স্বর্গীয় নীতি। সেখানেও বিপদ আছে বটে, কিন্তু সে বিপদের পূর্বাভাস পেয়ে আমরা প্রায়ই সাবধান হতে পারি। আরএখানকার নীতি কী? এখানকার একমাত্র নীতি হচ্ছে- হয় মরো, নয় মারো! জীবন আর মৃত্যু নিয়ে এখানে চিরদিনের এক নির্দয় খেলা চলছে। যে অপরকে মারতে পারবে না, এখানে তাকে অপরের হাতে মরতেই হবে। এ অরণ্য হচ্ছে এক মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র-যে

যুদ্ধে কোনওদিন সন্ধি নেই, শান্তি নেই। চারিদিকে ওই যে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি জেগে রয়েছে, ওর ভেতর থেকে আমি খালি এক কঠিন বাণীই শুনতে পাচ্ছি– হয় মরো, নয় মারো! এখানকার আকাশের নীলিমার মধুরিমা, চাঁদের আলোর ঝরনা, সবুজ পাতার গান আর নদীর কলতান যার মনে স্বপ্ন আর কবিত্ব সঞ্চার করবে সে নিরাপদ থাকতে পারবে না এক মুহূর্তও! বুঝেছ কুমার, এখানে এসে আমাদেরও সজাগ হয়ে সর্বদা এই মন্ত্রই জপ করতে হবে–হয় মরো, নয় মারো! কবিরা বনের নিষ্ঠুর ধর্ম ভালো করে জানেন না, কবিতার অরণ্যে তাই আমরা কেবল মাধুর্যকেই দেখতে পাই।

কুমার হাসতে হাসতে বললে, আমার বন্দুক তৈরি আছে বন্ধু! বলো, কাকে মারতে হবে? ওই চন্দ্রকিরণকে, না কাসিম মিয়াকে?

বিমল একটা হাই তুলে মুখের কাছে তুড়ি দিতে দিতে বললে, তুমি তৈরি আছ শুনে সুখী হলুম। থাক, আজকের মতো চাঁদের আলো আর কাসিম মিয়াকে অব্যাহতি দাও, এসো, এখন বিছানা পেতে ফেলে হাত-পা ছড়ানো যাক।

পরদিন সকালে বোটের কামরায় বসে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে বিমল চা-পানের আয়োজন করছিল।

কুমার বাইরে বসে দুই ধারের দৃশ্য দেখছিল।

দৃশ্যের কিছুই পরিবর্তন হয়নি, কেবল চাঁদের আলোর বদলে সূর্য এসে এখন দিকে দিকে কাঁচা সোনার জল ছড়িয়ে দিচ্ছে। নদীর দুই তীরে সবুজ বন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার ভেতর থেকে রাত্রের সেই ভয়ানক ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আর শোনা যাচ্ছে না। বোট একদিকের তীর ঘেঁসে যাচ্ছিল, কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই বনের ভেতরে গাছপালারা এমন নিবিড় ভাবে পরস্পরের সঙ্গে গা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে, বাইরে থেকে ভেতরের কিছুই নজরে আসে না। মাঝে-মাঝে যেখানে একটু ফাঁকা জায়গা আছে, সেখানটাকে দেখাচ্ছে ঠিক জলাভূমির মতো। সেখান দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে গেলে এক কোমর কর্মাক্ত জল ভেঙে অগ্রসর হতে হয়। সেই কর্দমাক্ত জলের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে

নলখাগড়ার দল। দূরে-দূরে বনের শিয়রে-শিয়রে দেখা যাচ্ছে কুয়াশার মতো বাষ্পের মেঘ।

এক জায়গায় দেখা গেল, কুৎসিত দেহের আধখানা ডাঙার ওপরে তুলে প্রকাণ্ড একটা কুমির স্থিরভাবে রোদ পোয়াচ্ছে। এত বড় কুমির, কুমার আর কোনওদিন দেখেনি। তার বন্দুকটা পাশেই ছিল, সে আস্তে-আস্তে সেটা তুলে নিয়ে কুমিরের দিকে নিজের লক্ষ্য স্থির করলে।

বিমল তখন দুটো চায়ের পেয়ালা হাতে করে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, কুমারের অবস্থা দেখে সেও কুমিরের দিকে দৃষ্টি ফেরালে। তারপর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, থামো কুমার, বন্দুক ছুড়ো না!

কুমার একটু আশ্চর্য হয়ে বন্দুক নামিয়ে বললে, কেন?

বিমল বললে, কুমিরের ঠিক ওপরে গাছের ডালের দিকে তাকিয়ে দেখো। এখন রাত নেই, কিন্তু জীবন-যুদ্ধের জের এখনও চলেছে।

কুমার সেইদিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, একটা প্রকাণ্ড গাছের ডাল জড়িয়ে মস্ত এক অজগর সাপ স্থির ভাবে কুমিরকে লক্ষ করছে। হঠাৎ তার মাথাটা ডাল থেকে একটুখানি নীচে নেমে পড়ল, তারপর দু-একবার এদিকে-ওদিকে দুলতে লাগল এবং তার পরেই ঠিক বিদ্যুতের ঝড়ের মতো তার দেহটা একেবারে কুমিরের ঘাড়ের ওপরে এসে পড়ল! তারপর সমস্ত জল তোলপাড় করে যে দৃশ্য শুরু হল ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না! কুমির চায়। তার বলিষ্ঠ লাঙ্গুলের প্রচণ্ড ঝাঁপটা মেরে অজগরকে কাবু করে জলে ডুব দিতে, আর অজগর চায় পাকে-পাকে কুমিরকে ক্রমেই বেশি করে জড়িয়ে ডাঙার ওপরে টেনে তুলতে।

এই বন্য নাটকের শেষ দৃশ্য দেখবার আগেই বোটখানা নদীর একটা মোড় ফিরে আড়ালে গিয়ে পড়ল।

কুমার বললে, কুমিরটাকে আমি মারতে পারতুম, অজগরটাকেও পারতুম! কিন্তু বিমল, প্রকৃতির অভিশাপ যাদের ওপরে এসে পড়েছে, তাদের কারুকে মারতে আমার হাত উঠল না। ওরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা পূরণ করুক।

বিমল বললে, এখন বন্দুক রেখে চা খাও! তারপর এসো, কাসিম মিয়ার সঙ্গে একটু কথা কওয়া যাক। ওরা আজ সকাল থেকে মাছ ধরতে বসেছে দেখছি।

পানসি থেকে বিমলের কথা শুনতে পেয়ে কাসিম বলে উঠল, হা হুজুর, হাতে কোনও কাজ নেই, কী আর করি বলুন?

বিমল বললে, মাছটাছ কিছু ধরতে পেরেছ নাকি কাসিম?

ধরেছি হুজুর! দুটো মাছ ধরেছি।

বেশ, বেশ, আমাদের দু-একটা উপহার দিও। কিন্তু বলতে পারো কাসিম, সে দ্বীপে গিয়ে পৌঁছতে আমাদের আরও কত দেরি লাগবে?

কাসিম বললে, আমাদের পানসিতে দাঁড় টেনে গেলে সেখানে পৌঁছতে হয়তো আরও দু-দিন লাগত। কিন্তু আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওই বিলিতি বোট, বোধহয় আজ রাতেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাব।

দুপুর গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যার পর আবার রাত এল। আকাশ থেকে আবার প্রতিপদের চাঁদের সাজি চারিদিকে আলোর ফুল ছড়াতে লাগল, অরণ্যের মর্মরধ্বনি ও নদীর জলকল্লোল আবার স্পষ্টতর হয়ে উঠল, বনভূমির ভেতর থেকে আবার ফুট ও অস্ফুট বিচিত্র সব ধ্বনি প্রতিধ্বনি শোনা যেতে লাগল–চারিদিকে আবার অন্ধকারের আবছায়ায় নানা বিভীষিকার সাড়া পাওয়া গেল।

নদী ক্রমেই চওড়া হয়ে উঠছে, দুই তীরের বন-রেখা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে।

কাসিম বললে, হুজুর, আমরা সুমুদুরের কাছেই এসে পড়েছি।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে নদীর দুই তীর এত দূরে সরে গেল যে, বনের ভেতরকার শব্দ আর বড় কানে আসে না। সেখানে শোনা যায় চারদিক-আচ্ছন্ন করা কেবল নদীর অশ্রান্ত কোলাহল। এ যেন নদী কল্লোলের পৃথিবী!

সেই কোলাহলের ভেতরে দূর থেকে আর একটা শব্দ বিমল ও কুমারের কানে ভেসে এল।

সে শব্দ কাসিমও শুনেছিল। সে উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠল, হুজুর, ও আবার কিসের আওয়াজ?

বিমলও কান পেতে শুনতে লাগল। শব্দটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তার মানে শব্দটা ক্রমেই তাদের কাছে এগিয়ে আসছে।

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, কাসিম, আমাদের মতো আর একখানা মোটরবোট এই দিকে আসছে। ও তারই শব্দ!

কুমার বললে, ওটা যে মোটরবোটের শব্দ তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, এমন অসময়ে এখানে কার ও মোটরবোট? হ্যাঁ কাসিম, এখান দিয়ে প্রায়ই কি এইরকম নৌকো আর মোটরবোট আনাগোনা করে?

কাসিম বললে, না হুজুর, এখান দিয়ে নৌকো আনাগোনা করে না। সেই বুড়ো বাবুটি পথ দেখিয়ে নিয়ে না এলে আমরা কোনওদিনই এদিকে আসতুম না।

বিমল বললে, কাসিম, তাহলে ওই মোটরবোটে চড়ে আসছেন তোমাদেরই সেই বুড়োবাবুটি!

কাসিম বললে, হতে পারে হুজুর, আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলুম, সেই বুড়োবাবুটি আবার রাইপুরে গিয়েছেন। হয়তো তিনিই ফিরে আসছেন।

বিমল বললে, তোমাদের সেই বুড়োবাবু রোজ এদিকে ফিরে আসুন, আমাদের তাতে কোনওই আপত্তি নেই! কিন্তু আজ তিনি আমাদের যাতে এইখানে দেখতে না পান, এখনি এমন কোনও ব্যবস্থা করতে হবে।

কুমার বললে, কিন্তু এই খোলা নদীতে লুকোতে গেলে নৌকোশুদ্ধ পাতালপ্রবেশ ছাড়া আমাদের তো আর কোনও উপায় নেই!

বিমল বললে, উপায় বোধহয় আছে কুমার! মাইল খানেক তফাতে ছোট একটা চরের মতো কী যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না? মোটরবোট যে চালাচ্ছিল তার দিকে ফিরে সে। বললে, ওহে, জোরে চালাও, খুব জোরে!

বোটের গতি তখন দ্বিগুণ বেড়ে উঠল এবং মিনিট কয়েক পরেই তারা একটা চরের কাছে এসে পড়ল।

গঙ্গাসাগরের কাছে সুন্দরবনের অসংখ্য নদীর ভেতরে এই রকম সব ছোট-ছোট চর দেখা যায়। বছরের অন্যান্য সময়ে এই চরগুলো জলের ওপরে জেগে থাকে, তার বুকে ঝোপঝাপ ও জঙ্গলের আবির্ভাব হয় এবং দূর থেকে তাদের দেখায় এক একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো। কিন্তু বর্ষার সময়ে নদীর জল যখন বেড়ে ওঠে তখন এইসব চরের কোনও চিহ্নই আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাদের বোট এইরকম একটা চরের কাছেই এসে পড়েছিল। এখানেও ঝোপঝাপ ও বনজঙ্গলের কোনও অভাব ছিল না।

বিমল বললে, আরও এগিয়ে মোড় ফিরে বোটখানাকে চরের ওপাশে নিয়ে চলো! ঝোপের আড়ালে গিয়ে পড়লে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।

বোটের চালক বিমলের কথামতোই কাজ করলে।

বিমলদের বোট দ্বিগুণ বেগে এগিয়ে এসেছিল বলে পিছনের বোটের ইঞ্জিনের আওয়াজ তখন আর শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু খানিক পরেই সেই শব্দটা ধীরে-ধীরে আবার জেগে উঠল।

কুমার বললে, বিমল, আমরা যখন ও-বোটের শব্দ শুনতে পেয়েছি, তখন ওরাও যে আমাদের শব্দ শুনতে পায়নি এমন কথা বলা যায় না।

বিমল চিন্তিত ভাবে বললে, তা যদি পেয়ে থাকে তাহলে ভাবনার কথা।

কুমার বললে, ভাবনা কিসের?

তুমি তো শুনেছ কুমার, দ্বীপের ওই ভদ্রলোক চান না যে আর কেউ তার ওখানে গিয়ে ওঠে। আমরা এসেছি শুনলে তিনি খুশি হবেন বলে মনে হচ্ছে না।

পিছনের মোটরবোটের শব্দ তখন খুব কাছেই এসে পড়েছে। কিন্তু চরের কাছে এসেই শব্দটা থেমে গেল।

বিমল মৃদুস্বরে বললে, কুমার, তোমার সন্দেহই সত্য। ওরা আমাদের বোটের শব্দ নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে। তাই ওরা বোট থামিয়ে লক্ষ করছে, আমরা কোথায় মিলিয়ে গেলুম।

কুমার বললে, ওরা যদি এদিকে আমাদের খুঁজতে আসে?

খুঁজতে যদি আসে তাহলে উপায় কী? তাদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করতেই হবে।

তুমি কি কোনওরকম বিপদের ভয় করছ বিমল?

বিপদ? বিপদের ভয় আছে কিনা ঠিক বলতে পারি না, তবে এখানে আমাদের দেখতে পেলে ওই বোটের লোকেরা হয়তো আমাদের নতুন জামাই বলে ভ্রম করবে না। কুমার, সকলের চোখের আড়ালে যারা লুকিয়ে এমন জায়গায় বাস করে, তারা খুব ভালোমানুষ বলে মনে হয় না।

কুমার আর কিছু না বলে তাড়াতাড়ি নিজের বন্দুকটা টেনে নিলে।

বিমল বললে, আমারও বন্দুকটা এগিয়ে দাও, সাবধানের মার নেই।

কাসিম ভীত স্বরে বললে, হুজুর, আমরা কী করব?

বিমল বললে, তোমরা আপাতত চুপ করে নৌকোর ভেতরে বসে থাক। দরকার হলে আমি তোমাদের ডাকব।

সেই অজানা মোটরবোটের শব্দ আবার জেগে উঠল।

কুমার বন্দুকটা পরীক্ষা করতে করতে চুপিচুপি বললে, বিমল, বোধহয় ওরা এইদিকেই খুঁজতে আসছে।

বিমল বললে, খুব সম্ভব তাই–

.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । অমানুষিক কণ্ঠস্বর

বিমল ও কুমার উৎকর্ণ হয়ে মোটরবোটের গর্জন শুনতে লাগল।

কিন্তু খানিক পরেই তারা বুঝতে পারলে, গর্জনটা ধীরে-ধীরে ঝিমিয়ে আসছে।

ক্রমে শব্দ এতটা ক্ষীণ হয়ে এল যে, আর কোনও সন্দেহ রইল না।

কুমার সানন্দে বলে উঠল, যাক বাঁচা গেল! ও বোটখানা এদিকে আসছে না, অন্যদিকে চলে যাচ্ছে!

বিমল বললে, কিন্তু ওদের মনে সন্দেহ হয়েছিল বলেই যে বোটখানা হঠাৎ এখানে থেমেছিল, সেটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে। এখন আমাদের উচিত হচ্ছে, ও-বোটখানাকে আরও খানিক এগিয়ে যেতে দেওয়া। ততক্ষণে এইখানে বসে-বসে বেঁধেবেড়ে খাওয়াদাওয়া সেরে নেওয়া যাক। ইকমিক কুকারে খিচুড়ি চড়িয়ে দাও কুমার! কাসিম মিয়া, আমাদের চুবড়ি থেকে একটি মুরগি বার করে স্বর্গে পাঠাব, না তোমরা দু-একটা মাছ উপহার দিতে পারবে?

সন্ধ্যার মায়া-আলো মিলিয়ে গেল, আকাশ থেকে নেমে এল অন্ধকারের যবনিকা। বিমলদের মোটরবোট চলছে–চারিদিকে চলচল ছলছল জলের কান্না!

প্রতিপদের চাঁদ উঠল। কিন্তু আজকে আর বন্যজীবনের কোনও ধ্বনি-প্রতিধ্বনি নেই–এমনকী কোনওদিকে বনজঙ্গলের কোনও চিহ্নই নেই,–ওপরে আছে খালি আকাশের অনন্ত চন্দ্রাতপ এবং ডাইনে আর বাঁয়ে, সুমুখে আর পিছনে আছে শুধু সেই চলচল ছলছল জলের কান্না!

চতুর্দিকে সেই অসীমতার অপূর্ব আভাস দেখে কুমার বললে, প্রলয়পয়োধিজলে নারায়ণ যেদিন বটপত্রে ভেসে গিয়েছিলেন, সেদিন তারও অবস্থা হয়েছিল বোধ করি আমাদেরই মতো! এই অকুল জলের জগতে আমাদের বোটখানাকে বটপত্রের চেয়ে বড় বলে মনে হচ্ছে না!

বিমল তখন কুমারের কথা মন দিয়ে শুনছিল না, সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ করছিল।

নৌকোর পিছনের হালের কাছে দাঁড়িয়ে কাসিমও সেই দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, ওই সেই দ্বীপ হুজুর!

বিমল বললে, তুমি ঠিক চিনতে পেরেছ তো কাসিম? কোনও ভুল হয়নি?

না হুজুর, ভুল হতে পারে না। এখানে আর কোনও দ্বীপ নেই।

বোট এগিয়ে চললদ্বীপ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

এখানটা সমুদ্র ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

কুমার বললে, এখানে যদি নৌকো ডোবে, বাঁচবার কোনও উপায়ই নেই!

বিমল বললে, বাঁচবার একমাত্র উপায় ওই দ্বীপ। কিন্তু ওখানেও আছেন সেই দ্বীপবাসী বৃদ্ধ-যিনি অতিথি পছন্দ করেন না।

কুমার বললে, কে জানে ওই দ্বীপের কী রহস্য!

কাসিম বললে, হুজুর, আপনারা কি আজকেই ওখানে গিয়ে নামবেন?

বিমল বললে, এই রাত্রে? নিশ্চয়ই নয়! আমরা ডাঙার কাছে একটা ঝুপসি জায়গা পেলেই নঙর করব। ডাঙায় নামব কাল সকালে। ড্রাইভার, তুমি মোটরের ইঞ্জিন থামাও, নইলে ও-শব্দ দ্বীপে গিয়ে পৌঁছবে। কাসিম, এখন বেশ জোয়ারের টান আছে, এইবারে তোমার নৌকো আমাদের বোটকে দ্বীপের কাছে টেনে নিয়ে যেতে পারবে?

কাসিম বললে, পারবে। তখনি সেই ব্যবস্থাই হল।

বিমল বললে, সবাই আস্তে আস্তে দাঁড় ফেলো। সাবধানের মার নেই।

দ্বীপ খুব কাছে এসে পড়ল। তার বনজঙ্গলে জ্যোৎস্নার ঝালর ঝিকমিক করছে এবং তার সর্বত্র বিরাজ করছে নিস্তব্ধ এক থমথমে বিজনতা।

কুমার বললে, বুড়ো এখন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপন দেখছে।

বিমল বললে, স্বপন দেখতে-দেখতে সে জেগে উঠতেও পারে।

দ্বীপের ভেতর থেকে জীবনের টু-শব্দটি পর্যন্ত কানে এল না। এখানে যে মানুষ আছে, গাছ-পাতার ফাঁক দিয়ে কোনও কম্পমান আলোক-শিখাও তার ইঙ্গিত দিলে না। এখানে যে প্রবল ও দুর্বল পশু আছে, পূর্ব পরিচিত বন্য নাট্যাভিনয়ের কোনও হুঙ্কার বা আর্তনাদও তার প্রমাণ দিলে না। বিমল ও কুমারের মনে হল গঙ্গাসাগরের লবণাক্ত অশ্রুজলের ওপরে অজানা বিভীষিকার ছায়া নাচিয়ে এই রহস্যময় দ্বীপ যেন পৃথিবীর ভেতরে থেকেও পৃথিবীর ভেতরে নেই!

বিমল চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করলে, কাসিম, বুড়োবাবুকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছিলে, সেখানটা তুমি চিনতে পারবে?

কাসিম মাথা নেড়ে বললে, না হুজুর! তিনি বোধহয় কোনও আঘাটায় নেমেছিলেন। এখানে কোনও ঘাট আছে কিনা আমরা জানি না।

বিমল বললে, তাহলে কাল সকালে আমাদেরও আঘাটাতেই নামতে হবে। আপাতত এক কাজ করো। ওই যেখানে অনেকগুলো বড়-বড় গাছ প্রায় জলের ওপরে হেলে পড়ে চারদিক অন্ধকার করে তুলেছে, ওইখানে গিয়েই নৌকো বাঁধে। এখন পর্যন্ত কেউ আমাদের দেখতে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না; এরপর একবার ওই অন্ধকারের ভেতরে গিয়ে ঢুকতে পারলেই আমরা আজকের রাতের মতো নিশ্চিন্ত হতে পারব।

কাসিম বললে, কিন্তু ও অন্ধকার তো ভালো নয় হুজুর! মাথার ওপরে গাছপালা– সেখানে অজগর থাকতে পারে। পাশেই ডাঙা–সেখানে বাঘ থাকতে পারে। যদি তাদের কেউ নৌকোয় এসে ওঠে?

আমরা কামরার সব জানলা-দরজা বন্ধ করে ভেতরে শুয়ে থাকব। এখন তো রাতদুপুর, বাকি রাতটুকু কোনওরকমে কাটিয়ে দিতে পারব বোধহয়।

নৌকো ও মোটরবোট ধীরে-ধীরে অন্ধকারের ভেতরে ঢুকল। সেইখান থেকে তারা দেখতে পেলে, আশপাশের কষ্টিপাথরের মতো কালো ও নিরেট ছায়ার সীমানা ছাড়িয়েই শুরু হয়েছে, মুক্ত আকাশ থেকে নেমে-আসা চাঁদের আলো-লহর-রূপোর জলতরঙ্গে নেচে-নেচে উঠছে আরও চিকন ফেনার মালা! সেই রূপময় তরল ও চঞ্চল অসীমতা নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে যে সুন্দর সংগীত গাইতে গাইতে, ভাবুকের মন নিয়ে তা শুনলে শান্তি ও আনন্দে প্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

সবাই কামরার ভেতরে ঢুকে দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলে।

বিছানা পেতে বিমল ও কুমার শুয়ে পড়ল।

এ-কথা সেকথা কইতে কইতে তাদের দুজনেরই চোখের পাতা তন্দ্রার আমেজে যখন। ভারী হয়ে এসেছে, তখন বাইরের জলকল্লোলের মাঝখানে আচম্বিতে কি-একটা বেসুরো শব্দ জেগে উঠল।

প্রথমে উঠল গাছের পাতার মর্মর শব্দ,-যেন তিন-চারটে বড়-বড় জীব ডাল-পাতার ভেতরে লাফাতে লাফাতে নৌকোর কাছে এগিয়ে আসছে।

বিমল ধড়মড় করে উঠে বসে বললে, অজগর নাকি?

তারপর শোনা গেল-কিচিরমিচির কিচিরমিচির কিচিরমিচির!

কুমার আবার পাশ ফিরে শুয়ে চোখ মুদে বললে, বাঁদর!

বিমলও আবার শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছে, এমন সময়ে শোনা গেল-কিচিরমিচির কিচিরমিচির কিচ মিচ কিচ কিচ-

কচমচে কাঁচা মাথা
কুচি কুচি কচুকাটা

কিছু যদি বোঝো দাদা,
ফিরে যাও ক্যালকাটা।

হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা!-সে কী হাসি, যেন থামতেই চায় না!

বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, ওঠো কুমার! বন্দুক নাও! আমি দরজা খুলে টর্চ জ্বেলে চারদিক দেখি, তুমি বন্দুক বাগিয়ে তৈরি হয়ে পাশে থাক! বিপদ দেখলেই বন্দুক ছুড়বে!

দরজা খুলে টর্চের উজ্জ্বল আলোকে কেবল দেখা গেল, বোটের ঠিক ওপরেই মস্ত বটগাছের দুটো-তিনটে ডাল খুব জোরে নড়ছে, যেন এইমাত্র কেউ সেখান থেকে লাফ মেরে ঘন পাতার আড়ালে সরে গিয়েছে।

কুমার বললে, প্রথমে বাঁদরের কিচিরমিচির, তারপরেই মানুষের গান আর হাসি!

বিমল বললে, বাঁদরের কিচিরমিচির ঠিকই শুনেছি বটে! কিন্তু যে গান আর যে হাসি শুনলুম, ও কি মানুষের? অমন অস্বাভাবিক আওয়াজ কোনও মানুষের গলায় কেউ কি কখনও শুনেছে?

কুমার আর একবার চারদিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, কিন্তু কোনও গাছে বাঁদরও নেই! তবে কি আমরা কোনও অশরীরীর সাড়া পেলুম?

বিমল হতভম্বের মতো বললে, এতদিন পরে শেষটা কি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করতে হবে?

খানিক তফাত থেকে আবার আর একরকম আওয়াজ জেগে উঠল- ঘটঘট ঘ্যাট ঘ্যাট ঘটঘট ঘ্যাট-ঘ্যাট।

কুমার চমকে বলে উঠল, ও আবার কী?

বিমল বললে, ওই শোনো!

ঘটঘট ঘ্যাট-ঘ্যাট ঘটঘট ঘ্যাট-ঘ্যাট–
ঘুটঘুটে আন্ধি,
একলাটি কান্দি,
রেখে গেছে বান্ধি।
সমুদ্রে।

মোটরের পান্ডা।
জল খুব ঠান্ডা,
মোরগের আন্ডা
দে ক্ষুদ্রে।

দাও যদি ঝম্প,
মোর মুখে লম্ফ–
নিবে যাবে লম্প
চক্ষের।

কেন শ্রম-যত্ন?
মোরা দুঃস্বপ্ন,
হেথা নেই রত্ন
যক্ষের!

বিমল তাড়াতাড়ি জলের ওপরে টর্চের আলো নিক্ষেপ করলে কিন্তু বৃথা, কোথাও জনপ্রাণী নেই, কেবল একজায়গায় জল অত্যন্ত তোলপাড় করছে-যেন কেউ সেখানে সবে ডুব দিয়েছে।

বিমল বোকার মতন কুমারের মুখের পানে তাকালে। কিন্তু কুমার বলে উঠল, বুঝেছি, বুঝেছি! এ-সব হচ্ছে ওই দ্বীপের বুড়োর চালাকি! নিশ্চয়ই সে ভেনট্রিলোকুজম জানে! লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে!

বিমল বললে, অসম্ভব নয়। কিন্তু গাছের ডাল কেন হঠাৎ দোল খায়, জল কেন হঠাৎ তোলপাড় করে?

কুমার যুতসই কোনও জবাব না দিতে পেরে বললে, বুড়ো হয়তো ম্যাজিকেরও নানান কল-কৌশল জানে!

বিমল বললে, ও-সব বাজে কথা ভাববার সময় এখন নয়। ওপরে গাছে, নীচে ডালে ভিন্ন-ভিন্ন গলায় কারা অমন অদ্ভুতরকম শব্দ করে, পদ্যে কথা কয়, হাহা করে হাসে, আমাদের ভয় দেখায়, আবার সাবধান করেও দেয়? তারা আমাদের দেখে কিন্তু নিজেরা দ্যাখা দেয় না! তারা স্পষ্টই বলছে–এ বড় মারাত্মক জায়গা, এখানে ধনরত্ন কিছুই নেই, ভালোয়-ভালোয় তোমরা প্রাণ নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাও! কে তারা? তারা শত্রু বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু তারা কি আমাদের বন্ধু?

হঠাৎ কোনওরকম পূর্বাভাস না দিয়েই সারা দ্বীপ যেন সশব্দে সজাগ হয়ে উঠল।

সমুদ্রে প্রবল বন্যার দুরন্ত গর্জনের মতো, আগ্নেয়গিরির অগ্নিহুঙ্কারের মতো, কল্পনাতীত কি এক ভয়াবহ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি যেন ক্রুদ্ধ আবেগে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে তুললে! এবং তারই মাঝে মাঝে আবার শোনা যেতে লাগল–কিচিরমিচির কিচিরমিচির কিচ মিচ কিচ! ঘ্যাট ঘ্যাট ঘটঘট ঘ্যাট-ঘ্যাট! বানর ও আর একটা কোনও পশুর ভীত আর্তনাদ!

কুমার বিহ্বলের মতো বললে, দ্বীপে ও কাদের চিৎকার? হুড়মুড় করে গাছ ভেঙে পড়ছে চিৎকারও যেন আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

ওদিকে পানসি থেকে কাসিমও সভয়ে চেঁচিয়ে বললে, হুজুর! আমার লোকজনরা ভয়ে পাগলের মতো হয়ে উঠেছে! বলছে, তারা এই শয়তানের দ্বীপের কাছে আর একদণ্ড থাকবে না! আমরা পানসি নিয়ে চলে যেতে চাই!

বিমল ফাঁপরে পড়ে বললে, সে কী কাসিম-মিয়া, তোমরা কি আমাদের এখানে ফেলেই পালাতে চাও?

কী করব হুজুর, ভূতের সঙ্গে কে লড়াই করবে? আমরা গরিব মানুষ, ঘরে মা বউ-বেটা আমাদের পথ চেয়ে দিন গোনে, আমরা কি ভূতের হাতে প্রাণ দিতে পারি?

বিমল বললে, শোনো কাসিম, আরও বকশিশ চাও তো বল!

কাসিম মাথা নেড়ে বললে, মাপ করবেন হুজুর! প্রাণ গেলে বকশিশ নেবে কে? ভাই সব! বোট থেকে আমাদের নৌকোর দড়ি খুলে নাও!

.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । বিপদ জলে-স্থলে

কিন্তু সামুদ্রিক বন্যার গর্জনের মতো, আগ্নেয়গিরির হুঙ্কারের মতো, কালবৈশাখীর বজ্রকণ্ঠের চিৎকারের মতো ও-সব কিসের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি দ্বীপের ভেতর থেকে ক্রমেই জলের দিকে এগিয়ে আর এগিয়ে আসছে? ও-সব সৃষ্টিছাড়া আওয়াজ তো কোনও প্রাকৃতিক বিপ্লবের নয়, ওদের উৎপত্তি যেন জ্যান্ত জীবজন্তুর কণ্ঠ থেকেই! পৃথিবীতে এমন কোনও জীবজন্তু আছে, যারা এমন সব ভয়ানক অপার্থিব চিৎকার করতে পারে?

সেই আশ্চর্য চিৎকার একেবারে দ্বীপের প্রান্তে নদীর ধারে এসে পড়ল। বিমল অবাক হয়ে দেখলে, একটা বনের অনেকখানি অংশ যেন হেলে বেঁকে একবার দুমড়ে পড়ছে এবং আর্তনাদ করে আবার শূন্যে ঠিকরে উঠছে,-তার ভেতরে যারা আজ এসে ঢুকেছে,

বনস্পতিরা তাদের যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না! সেই অসহনীয় অত্যাচারী কল্পনাতীত দুরন্তদের ভৈরব হুঙ্কার বনস্পতিদের আর্ত মর্মনাদকেও ডুবিয়ে দিলে।

কুমার হঠাৎ বিমলের কাঁধ চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, দেখো, দেখো!

বিমল আগেই দেখেছিল। চাঁদ তখন পশ্চিমদিকে গিয়ে একটা তালকুঞ্জের ফাঁক দিয়ে। উঁকি মারছে! আচম্বিতে সেই কুঞ্জের তালগাছগুলো চারিদিকে ঠিকরে পড়ল এবং তার মধ্যে বিকট দুঃস্বপ্নের মতো জেগে উঠল সুদীর্ঘ ও বিরাট একটা ছায়ামূর্তি চকিতের জন্যে! পরমুহূর্তে সেই মুর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তালগাছগুলোও আবার খাড়া হয়ে উঠে যেন বিষম যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল।

ওই মুহূর্তের মধ্যেই বিমল দেখে নিলে, সেই বিরাট দানবের দেহ প্রায় তালগাছগুলোরই মত উঁচু!

কাসিম কাঁপতে কাঁপতে বললে, হুজুর, আমার নৌকা খুলে দিয়েছি। আপনারা কী করবেন?

বিমল বললে, আমরাও যাব। ড্রাইভার, মোটরের স্টার্ট দাও। কাসিম, তোমাদের পানসি আমাদের বোটের পিছনে বেঁধে নাও।

হঠাৎ অন্ধকার জলের ভেতর থেকে আরও-অন্ধকার মস্ত একটা কুৎসিত মুখ জেগে উঠল–তার চোখদুটো জ্বলন্ত কয়লার টুকরোর মতো।

পানসির লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল, কুমির, কুমির!

কুমিরটা আবার ডুব মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গাছের একটা বড় ডাল হঠাৎ দোল খেলে–সেখানেও দুটো চোখ জুলজুল করছে! সেটা বানর, না মানুষ, না অন্য কোনও জীব তা বোঝা গেল না বটে, কিন্তু সে যে অত্যন্ত

আগ্রহভরে নৌকোয় লোকদের গতিবিধি লক্ষ করছে, এটুকু ভালো করেই বুঝতে পারা গেল।

দ্বীপের বনজঙ্গলের ভেতর থেকে এতক্ষণ যে ভীষণ হট্টগোল উঠে চতুর্দিক শব্দময় করে তুলেছিল, আচম্বিতে তা থেমে গেল। অরণ্যের ছটফটানিও বন্ধ হয়ে গেল। বিমল ও কুমারের মনে হল, যেন বিরাট এক নিস্তব্ধ বিভীষিকা দম বন্ধ করে ওঁত পেতে তাদের ওপরে হঠাৎ লাফিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে।

মোটরবোটের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল কে একজন হা-হা-হা-হা করে অট্টহাস্য করছে।

কুমার তাড়াতাড়ি টর্চের আলোটা সেইদিকে নিক্ষেপ করলে।

একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় এক দীর্ঘদেহ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সে মূর্তির কাছ পর্যন্ত টর্চের আলোকরেখা ভালো করে পৌঁছল না বলে তাকে স্পষ্ট করে দেখা গেল না; কিন্তু এটা বোঝা গেল, তার ধবধবে সাদা দীর্ঘ চুল, দাড়ি ও গায়ের জামাকাপড় লটপট করে হু-হু বাতাসে উড়ছে।

কাসিম বললে, ওই সেই বুড়ো ভদ্রলোক!

বিমল তার উদ্দেশে চিৎকার করে বললে, নমস্কার মশাই নমস্কার! এ-যাত্রা আর আপনার সঙ্গে আলাপ করা হল না।

সে মূর্তি যেন পাথরের মূর্তি। একটু নড়লও না, আর কোনও সাড়াও দিলে না।

মোটরবোট ক্রমেই দ্বীপ থেকে দূরে গিয়ে পড়ছে, দ্বীপ ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে। বিমল ও কুমার একদৃষ্টিতে সেই রহস্য-রাজ্যের দিকে তাকিয়ে গুম হয়ে বসে রইল।

তারপর দ্বীপটা যখন একেবারে চোখের আড়ালে চলে গেল, কুমার তখন একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, আমরা খালি সুন্দরবনের কাদা ঘেঁটেই ফিরে চললুম।

বিমল বললে, এত সহজে হাল ছাড়বার ছেলে আমি নই। আমরা আবার আসব, আর রীতিমতো প্রস্তুত হয়েই আসব। ও দ্বীপের কিছুই আমি জানতুম না বলে এবারে ব্যর্থ হতে হল, কিন্তু এর পরের বারের ইতিহাস হবে অন্যরকম।

কুমার বললে, কলকাতা থেকে আমরা আশি মাইলের বেশি দূরে এসেছি বলে মনে হচ্ছে না; মনে হয় আমরা যেন অন্য কোনও পৃথিবীতে এসে হাজির হয়েছি। যা দেখলুম, আর যা শুনলুম, তা স্বপ্ন না চোখ আর কানের ভ্রম?

বিমল বললে, আমাদের সামনে এখন অনেকগুলো প্রশ্ন রয়েছে। প্রথমত ওই বুড়ো কে? কেন সে এমন অদ্ভুত জায়গায় বাস করে? দ্বিতীয়ত, জল আর গাছের ওপর থেকে কারা ছড়া কেটে আমাদের সাবধান করে দিচ্ছিল? কেনই বা তারা এখানে থাকে আর কেনই বা দেখা দেয় না? তৃতীয়ত, দ্বীপের বনজঙ্গলের ভেতরে কারা অমন হট্টগোল আর হুড়োহুড়ি করছিল? চতুর্থত, তালগাছগুলো ঠেলে যে অসম্ভব বিরাট ছায়ামূর্তিটা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল, সেটা কী? পঞ্চমত, সেই বাঘের মতন বড় বিড়ালটা কি এই দ্বীপেই বাস করত? সে-রকম বিড়াল কি এখানে আরও আছে?

কুমার বললে, দ্বীপের ব্যাপার যা দেখলুম তাতে মনে হচ্ছে, বেশ একটি বড় দলবল না নিয়ে এলে আমারা ওখানে নামতেই পারব না।

বিমল বললে, হ্যাঁ। কেবল দলবল নয়, দলে বাছা-বাছা লোক নিতে হবে। কাসিমদের মতো ভিতু লোক নিয়ে কোনও কাজ হবে না। এবারে যখন আসব, তখন আমাদের দলে বিনয়বাবু, কমল আর রামহরি তো থাকবেই, তার ওপরে জনকয়েক বন্দুকধারী পুলিশের লোক যাতে পাওয়া যায়, সে চেষ্টাও করতে হবে; নইলে এবারে এসেও হয়তো দ্বীপে গিয়ে নামতে পারব না। দ্বীপে যারা আছে তারা বাধা দেবেই।

কুমার বললে, আর আমাদের বাঘা? সে কার কাছে থাকবে?

বিমল বললে, বাঘার মতন চালাক কুকুর অনেক মানুষের চেয়েও ভালো! এখানে তাকেও হয়তো দরকার হবে। সেও আমাদের দলে থাকবে।

পানসি থেকে কাসিম শুধোলে, হুজুর, আপনারা কোনদিকে যাবেন?

বিমল বললে, আমরা পোর্ট ক্যানিংয়ে গিয়ে নামব।

তাহলে হুজুর আমাদের রাইপুরের কাছে ছেড়ে দেবেন।

আচ্ছা। চলো কুমার, শেষ রাতে আমরা একটু ঘুমিয়েনি।

বিমলের কথা শেষ হবা মাত্রই হঠাৎ চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে তলিয়ে দিয়ে একটা আর্তনাদ জেগে উঠল–রক্ষা করো, রক্ষা করো!

বিমল ও কুমার বিস্মিতভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগল। এই জনমানবহীন জলের দেশে সাহায্য চায় কে!

তখন একটা ছোট্ট চরের পাশ দিয়ে বোট যাচ্ছিল। তারা চাঁদের নির্বাণোন্মুখ ম্লান জ্যোৎস্নায় দেখলে চরের ওপরে সাদা মতো চলন্ত কি একটা দেখা যাচ্ছে।

আবার আর্তনাদ শোনা গেল–রক্ষা করো! আমাকে এখানে ফেলে যেও না!

বিমল বললে, ড্রাইভার, বোট চরে ভেড়াও!

কাসিম ভীত স্বরে বললে, হুজুর, এও ভূতের কারসাজি! এখানে মানুষ থাকে না।

বিমল তার কথায় কর্ণপাত করলে না।

বোট চরে গিয়ে ঠেকল। টর্চ জ্বেলে দেখা গেল, একটা লোক পাগলের মতো নৌকোর দিকে ছুটে আসছে–তার জামাকাপড় ঘেঁড়া, চুল উশকোখুশকো দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত।

লোকটা কাতর স্বরে বললে, আজ তিনদিন অনাহারে এখানে পড়ে আছি। আমাকে বাঁচান।

বিমল তাকে নৌকোর ওপরে উঠতে বললে।

নৌকোয় উঠেই সে বললে, আগে আমাকে কিছু খেতে দিন।

কুমার তখনি একখানা পাঁউরুটি, কিছু মাখন ও খানিকটা জেলি এনে দিলে। লোকটা গোগ্রাসে তা খেয়ে ফেললে।

সে একটু ঠান্ডা হলে পর বিমল জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কেমন করে এখানে এলে?

সে বললে, গ্রহের ফেরে। আমি হচ্ছি কাঠের ব্যাপারী। নৌকো করে লোকজনের সঙ্গে এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলুম। পথে একটা দ্বীপ পেয়ে ভাবলুম, ওখানে নেমে দেখব ভালো কাঠের গাছ পাওয়া যায় কি না! সেই কুবুদ্ধিই হল আমার কাল। দ্বীপে গিয়ে নামবামাত্র চারিদিকে যেন দৈত্যদানবরা চিৎকার করতে লাগল আর ভূমিকম্প হতে লাগল। আমার দলের লোকদের কি হল জানি না, কিন্তু আমি দেখলুম, হাতির মতো কি একটা জানোয়ার তিরের মতো আমার দিকে তেড়ে আসছে!

বিমল বললে, সে জানোয়ারটাকে কি মস্ত একটা বিড়ালের মতো দেখতে?

বিড়াল? না, তাকে দেখতে হাতির মতো বড় যেন একটা ডালকুত্তা!

তারপর?

আমি তখন জলের কাছে ছিলুম। প্রাণের ভয়ে তখনি জলে ঝাঁপ দিলুম-সঙ্গে-সঙ্গে আমার খুব কাছেই প্রকাণ্ড একটা কুমির ভেসে উঠল! ডাঙায় প্রকাণ্ড অদ্ভুত জানোয়ার আর জলে কুমির দেখে আমার যে কি অবস্থা হল, সেটা বুঝতেই পারছেন! যদিও প্রাণের আশা আর

রইল না, তবু দিগিবিদক জ্ঞান হারিয়ে সাঁতার কাটতে লাগলুম, কারণ আমি শুনেছিলুম, মানুষ যখন সাঁতার কাটে কুমির তখন তাকে ধরতে পারে না। এ কথা সত্যি কিনা জানি না, কিন্তু সেই কুমিরটা নাছোড়বান্দার মতো আমার সঙ্গে-সঙ্গে অনেকদূর এল বটে, তবু আমাকে ধরবার কোনও চেষ্টাই করলে না! তারপর সে ডুব মারলে। আমার ভয় আরও বেড়ে উঠল, ভাবলুম জলের ভেতর থেকে এইবারে সে আমাকে কামড়ে ধরবে! ক্রমাগত পা ছুঁড়তে লাগলুম! সেইভাবে ভাসতে-ভাসতে যখন এই চরে এসে উঠলুম, তখন আমি আধমরা। এই চরেই আজ তিনদিন তিনরাত কেটে গেছে। আজ আপনাদের নৌকো এ-পথে না এলে আমি অনাহারেই মারা পড়তুম।

.

সপ্তম পরিচ্ছেদ । কুম্ভকর্ণের বংশধর

বিনয়বাবু তার পরীক্ষাগারে বসে একমনে আকাশের গ্রহ তারা দেখবার বড় দুরবিনটা সাফ করছিলেন, এমনসময়ে একখানা খবরের কাগজ হাতে করে কমল সেই ঘরে প্রবেশ করল।

কমলের পায়ের শব্দ বিনয়বাবু চিনতেন, কাজেই দূরবিন থেকে মুখ না তুলেই বললেন, এসো কমল!

কমল উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, বিনয়বাবু, আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন?

না। তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে, নতুন কোনও খবর আছে!

কেবল নতুন নয়, আশ্চর্য খবর!

বিনয়বাবু দুরবিন থেকে চোখ তুলে বললেন, আমরা মঙ্গলগ্রহে গিয়েছি, ময়নামতীর মায়াকাননে গিয়েছি, হিমালয়ের ভয়ঙ্করের দেশে গিয়েছি। আমাদের কাছে কি কোনও খবরই আর আশ্চর্য বলে মনে হবে?

কমল বললে, আচ্ছা, আগে আপনি খবরটা শুনুন। এই বলে সে কাগজখানা খুলে পড়তে লাগলঃ

‘ গঙ্গাসাগরে কুম্ভকর্ণ’

গঙ্গাসাগরের নিকটে এক অদ্ভুত রহস্যের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সাগরদ্বীপের নিকটস্থ নদ-নদীতে যাহারা নৌকা লইয়া আনাগোনা করে, সম্প্রতি তাহাদের ভেতরে অত্যন্ত বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছে।

কয়েকখানি নৌকার এবং তাহাদের মাঝি-মাল্লার ও লোকজনের কোনও খবর পাওয়া যাইতেছে না। তাহারা যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিল সেখানেও ফিরিয়া আসে নাই, অথবা গন্তব্যস্থলেও গিয়া উপস্থিত হয় নাই। যদি মনে করা যায় কোনওরকম দুর্ঘটনায় হঠাৎ নৌকাডুবি হইয়াছে, তবে এইকথা জিজ্ঞাসা হওয়া স্বাভাবিক যে, দুর্ঘটনা কি এমন নিয়মিত ভাবে ঘটিতে পারে? ঝড়-বাদল বা বন্যা নাই, অথচ পরে-পরে কয়েকখানা নৌকা আরোহীদের সহিত একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, একজন লোকেরও প্রাণরক্ষা হইল না? এটা কি যারপরনাই অস্বাভাবিক। নহে?

নদীর কেবল এক নির্দিষ্ট অংশের মধ্যেই নৌকাগুলি অদৃশ্য হইয়াছে। সাগরদ্বীপের পরে ফ্রেজারগঞ্জ। তাহার পর জামিরা নদী। তাহার পর বুলছড়ি দ্বীপ। তাহার পর মাতলা নদী। জামিরা নদীর জল যেখানে সুন্দরবনের মধ্যে ঢুকিয়া মাতলা নদীর সঙ্গে মিশিয়াছে, সেইখানেই কোনও এক জায়গায় গিয়া প্রত্যেক নৌকাই হঠাৎ অদৃশ্য হইয়াছে।

পুলিশের লোকেরা তদন্তে গিয়া আর এক বিস্ময়কর ব্যাপার আবিষ্কার করিয়াছে।

পুলিশের নৌকা একটা অজানা দ্বীপের নিকটে নোঙর ফেলিয়াছিল। শুক্লপক্ষের শুভ্র রজনী। নৌকার ওপরে বসিয়া একজন চৌকিদার পাহারা দিতেছিল।

দ্বীপের ওপরে হঠাৎ সে এক অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিল! প্রায় তালগাছ সমান উচ্চ ভয়াবহ এক মূর্তি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! দূর হইতে যদিও তাহার মুখ-চক্ষু দেখা যাইতেছিল। না, তবে সেটা যে কোনও দানব মনুষ্য-মূর্তি, সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নাই।

চৌকিদারের ভীত চিৎকারে নৌকার অন্যান্য লোক বাহিরে আসে এবং তাহারাও সেই বিরাট মূর্তিকে দেখিতে পায়! সকলে তখন নৌকা লইয়া সভয়ে পলায়ন করে।

যেসব নৌকা অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার সহিত উক্ত অমানুষিক মূর্তির কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, পুলিশ এখন এই কথা লইয়াই মাথা ঘামাইতেছে।

প্রকাশ, শীঘ্রই বৃহৎ এক পুলিশ বাহিনী ওই অজানা দ্বীপের দিকে যাত্রা করিবে।

স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস এই লঙ্কাদ্বীপের কোনও অজ্ঞাত অংশ হইতে কুম্ভকর্ণের বংশধরগণ সন্তরণ দিয়া সমুদ্র পার হইয়া গঙ্গাসাগরের নিকটস্থ ওই দ্বীপের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অদৃশ্য নৌকাগুলির আরোহীরা গিয়াছে তাহাদেরই বিপুল উদরের মধ্যে।

অবশ্য এরকম কুসংস্কারে আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু ব্যাপারটা যে ভালো করিয়া তদন্ত করা উচিত, সে বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে না। নহিলে সুন্দরবনের ও-অঞ্চলে নৌকা চলাচল একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে!

বিনয়বাবু তার মাথার কাঁচাপাকা চুল কগাছির ভেতরে আঙুল চালাতে-চালাতে একমনে সমস্ত কথা শ্রবণ করলেন। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, পৃথিবীতে কি আবার পুরাকাল ফিরে এল? এখানে দানবের অত্যাচার যেন ক্রমেই বেড়ে উঠছে! আমরা মৃণুকে উদ্ধার করতে গিয়ে হিমালয়ের যে-সব ভয়ঙ্করকে দেখে এসেছি, এতদিন অনেকে তাদের কথা বিশ্বাস করত না। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের এভারেস্ট অভিযানের লোকেরা হিমালয়ের টঙে যে বিরাট পদচিহ্ন দেখেছিল, সেটা তখন একটা মজার গল্প বলেই মনে করা হয়েছিল। কিন্তু

সে গল্প যে সত্য, আমরা তা প্রমাণিত করবার চেষ্টা করি। আমাদের চেষ্টা বেশি বুদ্ধিমানদের কাছে সফল হয়নি। তারপর গেল বছরে যখন খবরের কাগজে বেরুল যে, দার্জিলিংয়ের আরও নীচে আর বাংলাদেশের নানাস্থানে দানবের মতো বৃহৎ মানুষ দেখা গেছে, তখন আমাদের কাহিনির ওপরে লোকের শ্রদ্ধা হল। বিমল বলে, হিমালয়ের ভয়ঙ্কররা তাদের দেবীঅর্থাৎ আমাদের মৃণুকে সারাদেশে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং একদিন তারা মৃণুকে আবার খুঁজে বার করবেই করবে! গেল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখের স্টেটসম্যান কাগজে দেখেছি, মি. সিপটন নামে এক ভদ্রলোক হিমালয়ের ১৬,০০০ হাজার ফুট ওপরে বরফের গায়ে আবার দানবের পদচিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। বিমলের মত যদি ঠিক হয়, তবে কে বলতে পারে, মৃণুকে খুঁজতে খুঁজতে দু-একটা দানব গঙ্গাসাগরের কাছে গিয়ে হাজির হয়নি?

কমল বললে, বিমলবাবু আর কুমারবাবু যে গঙ্গাসাগরের কাছাকাছি কোনও একটা দ্বীপে দানব-বিড়ালের খোঁজে গিয়েছেন, সে কথাটাও মনে রাখবেন। দানবদের দেশে গিয়ে আমরা কিন্তু বাঘের মতো বড় কোনও বিড়াল-টিড়াল দেখতে পাইনি। সেখানকার কুকুর দেখেছি, সাধারণ কুকুরের চেয়ে সে বড় নয়। গঙ্গাসাগরের কাছে কি তাহলে দানব-জীবদের অজানা কোনও আস্তানা আছে?

বিনয়বাবু বললেন, কেমন করে তা বলব? তবে এইটুকু জানি যে, বিলাতেও দানব মানুষের কাহিনি কেবল গালিভারের গল্পে বা ছেলেভুলানো রূপকথায় পাওয়া যায় না। বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষরাও তাদের চর্মচক্ষে দেখতে পেয়েছে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পাহাড় হচ্ছে বেল মাকবুই। সে পাহাড়টি আছে হাইল্যান্ডারদের দেশে। যখন বরফ পড়ে তখন স্থানীয় লোকেরা কিছুতেই সেই পাহাড়ের ওপরে উঠতে রাজি হয় না। কারণ তারা বলে, বরফ পড়লেই সেখানে Lang mon-রা বেড়াতে আসে, তারা সাধারণ মানুষকে সুনজরে দেখে না! Lang mon হচ্ছে Long man-এরই রূপান্তর–অর্থাৎ লম্বা মানুষ। সকলেই এই লম্বা মানুষদের অলীক কল্পনা বলেই মনে করত। কিন্তু কিছুদিন আগে Alpine Club-এর ভূতপূর্ব সভাপতি আর এভারেস্ট অভিযানেরই এক সাহেব স্বচক্ষে

একজন লম্বা মানুষকে দেখতে পেয়েছেন। মাথায় সে উঁচু ছিল প্রায় ১২ ফুট! এই দুজন নির্ভরযোগ্য, বিখ্যাত আর শিক্ষিত দর্শকের কথা আজ আর কেউ উড়িয়ে দিতে পারে না।

কমল বললে, কিন্তু গঙ্গাসাগরের এই দানব-মানুষ নাকি প্রায় তালগাছের সমান উঁচু। হিমালয়ের ভয়ঙ্কররাও এদের চেয়ে ঢের ছোট ছিল।

বিনয়বাবু বললেন, উঁচু দানবের কথা যখন তুললে তখন আর-একটা সত্য কাহিনি বলি শোনো। এরও ঘটনাস্থল হচ্ছে বিলাতে, ডিভৎসায়ারে। ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময়ে, ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারির সকালবেলায় ডিভসায়ারের অনেকগুলো শহরের বাসিন্দারা সবিস্ময়ে দেখলে যে, বরফের ওপরে অদ্ভুত সব খুরের চিহ্ন সারি-সারি এগিয়ে গেছে! এ-ঘোড়া বা গাধা বা অন্য কোনও চতুষ্পদ পশুর খুরের দাগ নয়-এ দাগ হচ্ছে কোনও দু-পেয়ে জীবের। পৃথিবীতে এমন কোনও দু-পেয়ে জীব নেই যার পায়ে খুর আছে। প্রায় একশো মাইল পর্যন্ত চলে গেছে ওই আশ্চর্য পদচিহ্ন! যে সারারাত ধরে অশ্রান্ত ভাবে পথ চলেছে এবং একরাতে যে একশো মাইল পথ চলে, সে কীরকম জীব তা বুঝে দেখো! যেতে-যেতে একটা এক মাইল চওড়া নদীও (□□□□□ □□□) সে অনায়াসে পার হয়ে গেছে কারণ, তার পদচিহ্ন নদীর এপারে জলের ধারে শেষ হয়ে গিয়ে আবার ওপার থেকে আরম্ভ হয়েছে! পথে অনেক ছোট-বড় বাড়ি পড়েছিল, কিন্তু সেই রহস্যময় জীবটা কোনও বাড়ির ভেতরেই ঢোকেনি। অনেক বাড়ির ছাদের ওপরেও পদচিহ্ন পাওয়া যায়, আবার পদচিহ্ন অনেক বাড়ির এপাশে শেষ হয়ে গিয়ে ফের ওপাশ থেকে শুরু হয়েছে, তাদের ছাদের ওপরে কোনও দাগই নেই-যেন সে অনায়াসেই গোটা বাড়িটাই ডিঙিয়ে চলে গেছে! এখন ভাববার চেষ্টা করো, এ কোন জীব? এরকম পদচিহ্ন ডিভায়ারে তার আগে বা পরে আর কখনও দেখা যায়নি। তার খুরওয়ালা দুখানা পা, সে একমাইল চওড়া নদী পার হয়, অম্লানবদনে একরাতে একশো মাইল হাঁটে। বাড়ির ছাদে উঠে নেমে যায় বা বিনাকষ্টেই বাড়িকে-বাড়ি লঙঘন করে অগ্রসর হয়। স্থানীয় লোকেরা ধরে নিলে, গত রাত্রের তুষার-বৃষ্টির সময়ে শয়তান ডিভৎসয়ারে বেড়াতে এসেছিল কারণ প্রচলিত মতে, শয়তানের দুই পায়ে খুর আছে। এই ঘটনার পরে অনেক দিন পর্যন্ত ডিভৎসায়ারের

বাসিন্দারা সন্ধ্যার আগেই যে যার বাড়ির ভেতরে পালিয়ে এসে ভয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে থাকত।

কমল বললে, তবু লোকে বলে পৃথিবীতে এখন আর অসম্ভব ঘটনা ঘটে না!

বিনয়বাবু বললেন, আপাতত ও-সব কথা থাক। কমল, বিমল আর কুমার কি সুন্দরবন থেকে কোনও খবর পাঠিয়েছে? তারা তো এই দানবের খবর পাওয়ার আগেই গঙ্গাসাগরের দিকে গিয়েছে, এর জন্যে প্রস্তুত হয়েও যায়নি, যদি তারা কোনওরকম বিপদে পড়ে?

এমন সময়ে একতলা থেকে শোনা গেল, একটা কুকুর পরিচিত গম্ভীর স্বরে ডেকে উঠল–ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!

কমল উৎসাহ ভরে লাফিয়ে উঠে বললে, ওই বাঘা আমাদের ডাকছে! বাঘা যখন আসছে, তখন ওইসঙ্গে বিমলবাবুদেরও দেখা নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

বলতে-বলতে ঘরের দরজাটা দুম করে খুলে গেল এবং বিমল ও কুমারের আগে আগে বাঘা ভেতরে ঢুকে বিনয়বাবুর কাছে গিয়ে দু-পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামনের পা দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরে নিজের প্রাণের আনন্দ জ্ঞাপন করলে। তারপর কমলকেও সেইভাবে আদর করে বিপুল বেগে পটপট রবে ল্যাজ নাড়তে লাগল!

বিনয়বাবু বললেন, এই যে! তোমরা যে এরি মধ্যে ফিরে এলে?

বিমল বললে, আমরা ফিরে এলুম না বিনয়বাবু, পালিয়ে এলুম!

দানব-মানুষের ভয়ে?

এই যে, আপনিও খবর পেয়েছেন দেখছি! হ্যাঁ, দানবের ভয়েই বটে! কিন্তু পালিয়ে এসেছি আটঘাট বেঁধে পুনরাক্রমণ করব বলে।

আবার তোমরা যাচ্ছ?

নিশ্চয়! কিন্তু এবারে কেবল আমরা দুজনই নই, আপনি যাবেন কমল যাবে রামহরি যাবে-এমনকী বাঘাও পড়ে থাকবে না! নিন! উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। আমরা প্রস্তুত, আপনারাও দ্বিগুণ উৎসাহে মোটমাট বেঁধে তৈরি হয়ে নিন! আমরা কালকে সকালেই যাত্রা করব!

বিনয়বাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, তার মানে?

তার মানে, কাল সকালেই আমরা আপনাদের নিয়ে সম্ভবের মুল্লুক থেকে অসম্ভবের দেশে যাত্রা করব! তালগাছের মতো উঁচু মানুষ! হাতির মতো বড় ডালকুত্তা! বাঘের মতো মস্ত বিড়াল! পুলিশের লঞ্চ আর বন্দুকধারী সেপাই আমাদের সাহায্য করবার জন্যে এতক্ষণে প্রস্তুত হয়েছে, আমাকে ডানপিটে বলে গালাগাল দিতে দিতে আর রাগে গরগর করতে করতে বুড়ো রামহরি পর্যন্ত সমস্ত তল্পিতল্পা বেঁধে নিয়েছে, আর আপনারা এখনও অলস হয়ে এখানে বসে আছেন? ছিঃ বিনয়বাবু! ছিঃ কমল!

বিনয়বাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, কি আশ্চর্য! আমরা কেমন করে জানব যে–

বাধা দিয়ে বিমল বললে, ব্যস, ব্যস, আর কথা নয়। এখন জেনেছেন তো? কাল সকালে আমরা সুন্দরবনে যাত্রা করব, আপনার জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিন! আমাদের হাতে এখনও অনেক কাজ রয়েছে-চলো কুমার, আয় বাঘা!

বাঘা বিনয়বাবুর দিকে ফিরে আবার বললে-ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ কুকুর-ভাষায় তার অর্থ বোধহয়-কর্তা, এখন আসি!

বিমল ও কুমার দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বিনয়বাবু হতাশভাবে ধপাস করে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, না, আমার অপঘাত-মৃত্যু না ঘটিয়ে বিমল বোধহয় ছাড়বে না! ওরা এল আর গেল যেন কালবোশেখির মতো,-এখন সামলাও ধাক্কা!

খিলখিল করে হেসে উঠে কমল বললে, আমার কিন্তু ভারী মজা লাগছে।

বিনয়বাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, তা তো লাগবেই, সব গাধারই যে এক বুলি! কিন্তু আমার বয়স যে পঞ্চাশ পার হয়েছে, আমার কি এ-সব পোষায়, না শোভা পায়?

দুষ্টু কমল বললে, শাস্ত্রে বলে পঞ্চাশোর্ধে বনে যেতে। আপনি তো সুন্দরবনেই যাচ্ছেন বিনয়বাবু! যে-সে বন নয়, পরমসুন্দর বন!

বিনয়বাবু আরও রেগে বললেন, থামো, থামো! আর জ্যাঠামি করতে হবে না!

.

অষ্টম পরিচ্ছেদ । অমানুষিক কণ্ঠস্বর

আবার সেই সুন্দরবন! নির্জন বনভূমির মধ্যে আবার সেই নদীর জলতরঙ্গ বাজনা! সে যেন নিস্তব্ধতার বীণায় কার মূচ্ছা ভাঙাবার অশ্রান্ত সুর!

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ আজ দেরি করে মুখ দেখাবে। জ্যোৎস্নার যে কুহকস্বপ্ন নিয়ে বিমল ও কুমার গেলবারে ফিরে গিয়েছিল, এবার তারা সেই মাধুর্যের অভাব অনুভব করতে লাগল। অত্যন্ত। আকাশে একটিমাত্র উঁদকে দেখা না গেলে বনবাসী রাত্রির চেহারা যে কি-রকম বদলে যায়, যারা তা দেখেনি তারা কিছুতেই বুঝতে পারবে না। আকাশে কোটি-কোটি তারকার নির্নিমেষ নেত্রে যেটুকু আলোর বোবা ভাষা ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে কিছুমাত্র সান্ত্বনার আভাস নেই। বাতাসে-বাতাসে কি যেন একটা বুকচাপা স্বপ্ন ভেসে বেড়াচ্ছে! কে যেন ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে গিয়ে আতঙ্কে কাঁদতে পারছে না! অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার! পায়ের তলা থেকে নদী সাড়া দিচ্ছে, দুপাশ থেকে বিরাট অরণ্যের শিউরে-ওঠা মর্মর আতাঁরব শোনা যাচ্ছে এবং তার জঠর থেকে ভেসে-ভেসে আসছে লক্ষ লক্ষ নিশাচর জীবের জীবন-যুদ্ধের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি! কারুকেই দেখবার যো নেই, কেবল শব্দ-কেবল শব্দ! অন্ধকারের বিভীষিকা সমস্ত ধ্বনি-প্রতিধ্বনিকে করে তুলেছে ভয়াবহ! যে-দেশে তারা সবাই আজ যাত্রা করেছে, পথের এই অন্ধকারময় বিভীষিকা তারই স্বরূপের আভাস দেওয়ার চেষ্টা করছে!

গভীর আঁধার-সাগরে যেন ভেসে চলেছে দুটি ছোট-বড় আলোক দ্বীপ–বিমলদের মোটরবোট ও পুলিশের ইস্টিমার!

বোটের কামরার ভেতরে বসে রামহরি ইকমিক কুকারে রান্না চড়িয়ে দিচ্ছে এবং এখনও আহারের যথেষ্ট বিলম্ব দেখে বাঘা কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছে। অত্যন্ত উজ্জ্বল পেট্রোলের লণ্ঠনের আলোকে কমল একখানা গল্পের বই পড়ছে এবং বিনয়বাবু, বিমল ও কুমার কথাবার্তা কইছে।

বিমল বলছিল, না বিনয়বাবু, এই দ্বীপে হিমালয়ের সেই ভয়ঙ্কর দানবেরা এসে যে আস্তানা গেড়েছে, এটা আমার বিশ্বাস হয় না। হিমালয়ের ভয়ঙ্করদের কাহিনি যে আমাদের কল্পনার দুঃস্বপ্ন নয়, বাংলাদেশে এখন এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে বলে আমি খুবই খুশি হয়েছি, কিন্তু সেদিন দ্বীপের ওপরে যে দানবমুর্তির আভাসমাত্র দেখেছি, হিমালয়ের ভয়ঙ্কররাও হাত বাড়িয়ে তার মাথার নাগাল পাবে বলে মনে হয় না! সে এক নতুন আর অসম্ভব দানব!

বিনয়বাবু বললেন, তুমি আভাসমাত্র দেখেছ? তোমার চোখের ভ্রম হতেও তো পারে?

আমাদের চোখের ভ্রম যদি হয়ে থাকে, তাহলেই মঙ্গলের কথা। কারণ, ওই দ্বীপে। অমন সৃষ্টিছাড়া দানব যদি আরও গোটাকয়েক থাকে, তাহলে এই যাত্রাই আমাদের শেষযাত্রা হতেও পারে!

রামহরি প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে বলে উঠল, খোকাবাবু, এই বুড়োবয়সে ভূতুড়ে রাক্ষসের খোরাক হওয়ার জন্যেই কি তোমরা আমাকে ধরে আনলে?

কুমার হেসে ফেলে বললে, ভয় কি রামহরি, গঙ্গাসাগরে মরলে রাক্ষসের পেটের ভেতর থেকে আবার বেরিয়ে তুমি সোজাসুজি স্বর্গে গিয়ে হাজির হতে পারবে! সকলে তখন মহা-পুণ্যবান বলে তোমাকে হিংসা করবে!

রামহরি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললে, থামো-থামো, আর কথার ফোড়ন দিতে হবে না, ঢের হয়েছে। রাক্ষসের পেটেই যদি হজম হই, তাহলে স্বর্গে যাবে কে?

কুমার বললে, এইবারে রামহরি, তুমি নিরেট বোকার মতো কথা কইলে! রাক্ষসের খুঁড়ি বড়জোর তোমার দেহকেই হজম করতে পারে, কিন্তু তোমার আত্মাকে হজম করে এমন সাধ্য কার আছে? মানুষের দেহ তো স্বর্গে যায় না, স্বর্গে যায় তার আত্মাই!

রামহরি বললে, অমন স্বর্গে যাওয়ার পায়ে আমি গড় করি,-অমন করে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না!

কমল বই থেকে মুখ তুলে বললে, বিনয়বাবু, আপনি ভাবছেন বিমলবাবুদের চোখের ভ্রম হয়েছে। কিন্তু আপনি খবরের কাগজের রিপোর্ট ভুলে যাচ্ছেন কেন? তাতেও তো এখানকার একটা দ্বীপে তালগাছ-সমান উঁচু এক দানবের কথা আছে!

বিনয়বাবু বললেন, কি জানি বাপু, এখানকার ব্যাপারটা আমার মনে কেমন একটা অমঙ্গলের ভাব জাগিয়ে তুলছে! মনে হচ্ছে এদিকে না আসাই যেন উচিত ছিল!

কুমার জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললে, এতক্ষণে চাঁদ উঠল! কিন্তু চাঁদের আজ জেল্লা নেই!

বিনয়বাবু একটা অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, নাই বা রইল জেল্লা! চাঁদ যে উঠেছে, এই অন্ধকরা অন্ধকারে সেইটেই হচ্ছে বড় কথা। এতক্ষণ আমার তো মনে হচ্ছিল, চাঁদের বুঝি মৃত্যু হয়েছে, আলো আর ফুটবে না!

কমল বললে, কিন্তু ও চাঁদ যেন অন্ধকারকেই ভালো করে দেখাবার চেষ্টা করছে। গাছের তলায় নড়ন্ত ছায়াগুলোকে দেখে সন্দেহ হয়, ওরা যেন বিরাটদেহ প্রেতমূর্তি, আমাদের ঘাড় ভাঙতে পারলে আর ছেড়ে কথা কইবে না!

রামহরি কাজ করতে করতে মুখ তুলে ভয়ে-ভয়ে বনজঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বললে, সন্দেহ আবার কি, সত্যিকথাই! নিশ্চয় ওখানে ভূত-প্রেত আছে!

বিমল বললে, পৃথিবীর শৈশবে আদিম মানুষরা গিরিগুহার ভেতর থেকে বাইরের আলো আঁধারিতে চোখের ভ্রমে অমনি সব কত বিভীষিকাই দেখতে পেত। সেই সময় থেকেই ভূত প্রেতের মিথ্যা ভয়ের সৃষ্টি। সে ভয় আজও আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে পণ্ডিত হয়েও মানুষ তাই তাকে আর ভুলতে পারে না।

হঠাৎ বাঘা একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে কানদুটো খাড়া করে কি শুনতে লাগল!

বিমলও বাইরের দিকে তাকালে। বোট তীরের একদিক ঘেঁষে যাচ্ছিল-দেখা গেল কেবল খানিককালো আর খনিক-আলোমাখা গাছপালা। সেখানে কোনও জীবজন্তুর সাড়া পর্যন্ত নেই।

আচম্বিতে শোনা গেল –

ঘোঁ-ঘটঘট ঘোঁ ঘটঘট ঘোঁ-ঘটঘট ঘটঘট! ঘণ্টা বাজে যমালয়ে, কে যাবি আয় চটপট!

কুমারের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল এবং বাঘাও বোটের ধারে গিয়ে জলের ধারে ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করতে লাগল।

বিমল লাফিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল, অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় হু-হু করে জলস্রোত ছুটে চলেছে, তা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না!

রামহরি ঠক-ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, কোথাও জনপ্রাণী নেই, তবে এমন হেঁড়ে গলায় ভয়ানক চেঁচিয়ে কে কথা কইলে খোকাবাবু?

সত্যসত্যই সে এমন উচ্চ কণ্ঠস্বর যে, পিছনের ইস্টিমারে পুলিশের লোকেরাও তা শুনতে পেয়েছিল, ইস্টিমারের সার্চলাইট তখনি নদীর বুকের ওপরে তীব্রোজ্জ্বল আলোক-সেতুর

মতন গিয়ে পড়ল, তারপর সে অরণ্যের বক্ষভেদ করেও খুঁজে দেখলে, কিন্তু কোথাও জ্যান্ত কোনও কিছুর সন্ধান পাওয়া গেল না!

বিনয়বাবু হতভম্বের মতো বললেন, এ কী ব্যাপার, কুমার? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

কুমার বললে, এ কণ্ঠস্বর গেল-বারেও আমরা দ্বীপের কাছে এসে শুনেছি। কিন্তু কে যে-কথা কয়, কিছুতেই দেখতে পাইনি!

কমল বললে, মানুষের কথা শুনলুম বটে, কিন্তু এমন বিকট স্বরে কোনও মানুষ কি কথা কইতে পারে?

বিমল বললে, দ্বীপটা এখনও মাইল দশ-বারো দূরে আছে বোধহয়। কিন্তু গেল বারে কেউ তো দ্বীপ থেকে এত দুরে এসে এমন স্বরে কথা কয়নি!

কুমার বললে, তাহলে আমরা যে আবার আসছি, এরমধ্যেই কি দ্বীপে সে-খবর পৌঁছে গেছে?

বিমল জবাব দেওয়ার আগেই অনেকদূর থেকে আবার সেই উকট ভৈরব আওয়াজ জেগে উঠল–

ঘোঁ-ঘটঘট ঘোঁ- ঘটঘট ঘটঘট ঘটঘট!

বিমল বললে, এ ভালো লক্ষণ নয়! শব্দটা দ্বীপের দিকেই চলে যাচ্ছে!

রামহরি বলে উঠল, রাম রাম রাম রাম! অনেক ভূতের কথা শুনেছি, কিন্তু শব্দ ভূতের কথা তো কখনও শুনিনি!

বিমল বললে, কুমার, বাঘার গলায় শিকল দাও! ও পাগলের মতো হয়ে উঠেছে– জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়!

বিনয়বাবু বললেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু ওর পশু-চোখ বোধ হয় জলের ভেতরেই কোনও বিপদকে আবিষ্কার করেছে!

বিমল টর্চ নিয়ে আবার নদীর ভেতরটা দেখতে লাগলঝাপ্সা চাঁদের আলো আর আবছায়া নিয়ে লোফালুফি করতে করতে ও পাক খেতে-খেতে প্রবল জলের স্রোত ছুটছে এবং চিৎকার করে যেন নিকটস্থ সমুদ্রকে ডাকের পর ডাক দিচ্ছে! জলচর কুমির ও হাঙর ছাড়া সেখানে কোনও মানুষের পক্ষে এতক্ষণ ডুব দিয়ে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব!

ইস্টিমার থেকে মেগাফোনে মুখ দিয়ে ইনস্পেকটর জিজ্ঞাসা করলে, এখানে কোনও লোক ভয়ানক চেঁচিয়ে কথা কয়েছে। আপনারা কেউ দেখতে পেয়েছেন?

বিমল বললে, না!

বিনয়বাবু বললেন, বিমল, আমার মতে, আজ রাতে দ্বীপের কাছে না যাওয়াই ভালো। আজ এইখানেই নোঙর ফেলে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক, কাল সকালে আলোয়-আলোয় দ্বীপের কাছে গিয়ে হাজির হব।

বিমল বললে, আমারও সেই মত।

পরদিন পূর্ব-আকাশে প্রভাত এসে যখন রঙিন আলোর লাইন টানছিল, বিনয়বাবু তখন বোটের ভেতর থেকে বাইরে এসে বসলেন।

কাল সারারাত তার অশান্তিতে কেটেছে, একবারও ঘুম আসেনি, কারণ জলধারার। একটানা ঐকতানের মাঝে-মাঝে সেই অমানুষিক মানুষের চিৎকার আরও কয়েকবার জেগে উঠেছে–অনেক দূর থেকে।

কার এই কণ্ঠস্বর! এ যদি কোনও দানবের কণ্ঠস্বর হয় তাহলে কোথায় সে? সে দানবের আকার যদি আশ্চর্য রকম প্রকাণ্ড হয়, তবে তাকে তো আরও সহজেই দেখতে পাওয়ার

কথা! আর, এই গভীর নদীর গর্ভে কোনও নরদেহী দানবের এতক্ষণ ধরে থাকবার ঠাঁইই বা কোথায়?

এই-সব উত্তরহীন প্রশ্ন নিয়েই বিনয়বাবুর রাত কেটে গেছে, এখন ভোরের আলো দেখে বাইরে এসে বসে তিনি অনেকটা আরামবোধ করলেন। রামহরি তার আগেই উঠে তখন চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে গেছে-স্টোভে চায়ের জল গরম হচ্ছে এবং আর একটা স্টোভ জ্বালিয়ে অমলেট ভাজবার উদ্যোগ চলছে! রামহরি সকলকে বেঁধে খাওয়াতে ভারি ভালোবাসত, বিষম সব বিপদ-আপদের মাঝখানেও এ-বিভাগের কর্তব্যপালনের জন্যে সে সাধ্যমতো চেষ্টা করত। তাই পৃথিবীর ভেতরে ও বাইরে অনেক সৃষ্টিছাড়া দেশে গিয়েও বিমল ও কুমার প্রভৃতিকে কখনও কোনও কষ্টবোধ করতে হয়নি।

রাত্রের বিভীষিকা রোদের সোনার-জলের ধারায় কুয়াশার মতোই ধুয়ে-মুছে গিয়েছে, নদীর কলধ্বনি শুনে মনে হচ্ছে যেন ছোট্ট শিশুর খুশিভরা হাসির শব্দ! দুরে বনে-বনে গায়ক পাখির দলও জেগে উঠে চারিদিক সরগরম করে তুলেছে এবং বাতাসের উচ্ছ্বাসে ভেসে আসছে। যেন কোনও চন্দনস্নিগ্ধ পুলকস্পর্শ!

বিমল, কুমার ও কমল বাইরে এসে বসতে-না-বসতেই রামহরি সকলের সামনে চায়ের পিয়ালা এবং প্লেটে করে গরম টোস্ট ও অলেট সাজিয়ে দিয়ে গেল।

বাঘাও যথাসময়ে অত্যন্ত সভ্য-ভব্যের মতো সকলের মাঝখানে এসে বসে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে রামহরির গতিবিধি লক্ষ করছিল। তার জন্যেও এল কতকগুলো কুকুর-বিস্কুট।

বিমল আগে বোট ও ইস্টিমার চালাবার হুকুম দিলে, তারপর এক স্লাইশ রুটি তুলে নিয়ে বললে, বিনয়বাবু, আর ঘণ্টাদুয়েক পরেই আমরা সেই দ্বীপের কাছে গিয়ে হাজির হতে পারব।

বিনয়বাবু বললেন, তারপর?

তারপর আমরা একেবারে তীরে গিয়ে নামব।

যদি কেউ বাধা দেয়?

ইস্টিমারে মিলিটারি পুলিশ আছে–এমনকী একটা মেশিনগানও আছে। যদি সত্যিই সেখানে কোনও বিপদজনক অতিকায় বিড়াল, কুকুর, বাঘ বা দানব থাকে, তাহলে তাদের মেজাজ ঠান্ডা করবার জন্যে আমরা কোনও আয়োজনেরই ত্রুটি করিনি।

কিন্তু এইসব অদ্ভুত জীবের সঙ্গে সেই দ্বীপবাসী বৃদ্ধের সম্পর্ক কি, সেটা তো আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না! লোকালয়ের বাইরে এমন বিজন জায়গায় নির্বাসিতের মতো বসে দানব-জীবদের নিয়ে তিনি কী করেন? দানবের ভয় তার যখন নেই, তখন এটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে, দানবরাও তার ওপরে কোনও অত্যাচার করে না!

কুমার বললে, আরও একটা মস্ত জানবার কথা হচ্ছে, এমন এক তুচ্ছ অজানা দ্বীপের বিড়াল আর কুকুর কেমন করে বাঘ আর হাতির মতো প্রকাণ্ড হয়ে উঠল?

বিনয়বাবু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, কিন্তু এসব কি সত্যি?

বিমল বললে, কুকুরটাকে আমি দেখিনি বটে, কিন্তু বাঘের মতো বড় একটা বিড়ালকে আমি নিজেই যে গুলি করে মেরেছি সে কথা তো আপনি শুনেছেন?

বিনয়বাবু বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার! আর তার চেয়েও আশ্চর্য হচ্ছে এই যে, যেখানেই আশ্চর্য ব্যাপার, সেইখানেই তোমরা? আমাদের এই নিত্য-দেখা একঘেয়ে পৃথিবীটাকে তোমরা ক্রমেই অসাধারণ আর বিচিত্র করে তুলছ!

বোট ও ইস্টিমার তখন ছুটে চলেছে পুরোদমে–কেবল একদিকেই নদীর বনশ্যামল তটরেখা দেখা যাচ্ছে, অন্য তীর হারিয়ে গেছে প্রায় অসীমতার মধ্যেই।

হঠাৎ কুমার দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দূরে ওই সেই দ্বীপ দেখা যাচ্ছে!

আর সকলেও সাগ্রহে দাঁড়িয়ে উঠল। দূরে একটা গাছপালাভরা ভূমি জেগে উঠেছে বটে! বিমল খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে বললে, হা, কুমারের চোখ ঠিক দেখেছে।

ধীরে-ধীরে দ্বীপটা স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু বাহির থেকে সে দ্বীপের মধ্যে কোনও নতুনত্বই আবিষ্কার করা গেল না–প্রবল হাওয়ায় গাছপালা দুলছে এবং নদীর জলে ঝিলমিল করছে তাদের ছায়া! কালকের রাতের সেই অমানুষিক কণ্ঠস্বর আজ আর কারুকে ভয়াবহ অভ্যর্থনা করলে না এবং বনজঙ্গলের ওপরে তালগাছ-সমান উঁচু দেহ নিয়ে কোনও বিরাট দানবও আবির্ভূত হল না!

বিনয়বাবু একটা দূরবিনের সাহায্যে দ্বীপটা পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ তিনি চমকে উঠে দূরবীক্ষণটা বিমলের হাতে দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললেন, দেখো বিমল, দেখো!

দুরবিনটা তাড়াতাড়ি চোখে লাগিয়ে বিমল দেখলে, দ্বীপের একটা উঁচু জমির ওপরে একটি লোক পাথরে তৈরি মূর্তির মতো স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে–যেন সে ইস্টিমারের দিকেই তাকিয়ে আছে নিষ্পলক নেত্রে! আজকেও তার ধবধবে সাদা লম্বা চুল, দাড়ি ও গায়ের জামাকাপড় লটপট করে হুহু বাতাসে উড়ছে!

দূরবিনটা নামিয়ে বিমল বললে, ওই সেই দ্বীপবাসী বৃদ্ধ! এখানে যত রহস্যের সৃষ্টি বোধহয় ওই লোকটির জন্যেই! যাক, সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে যেতে আর বেশি বিলম্ব নেই!

.

নবম পরিচ্ছেদ । উড়ো বোট

দ্বীপ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে।

গেলবারে রাত-আঁধারে আর নানারকম অস্বাভাবিক ধ্বনি-প্রতিধ্বনির বিভীষিকার জন্যে এই অজানা দ্বীপটাকে যেমন রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল, আজ তাকে দেখে বিমল ও কুমারের মনে তেমন কোনও ভাবেরই উদয় হল না।

নীল-আকাশের ছায়া-দোলানো নদীর গান-জাগানো চপল জলের কোলে আজ এই সূর্যকরের আলো-আদর-মাখা সবুজ সুন্দর দ্বীপটিকে মনে হতে লাগল ঠিক যেন কোনও ভোরের স্বপ্নে দেখা পরিস্থানের মতো!

গায়ক পাখিরা গাছের এ-ডালে বসে খানিক নেচে আবার ও-ডালে উড়ে গিয়ে বসে নাচ-গানে মেতে উঠছে, ছবিতে আঁকা শকুন্তলার তপোবনের হরিণের মতো দুটি ছোট-ছোট হরিণ এক জায়গায় চুপ করে বসে আছে একান্ত নির্ভয়ে এবং দ্বীপের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। দলে-দলে বকেরা আকাশে দোলন্ত বেলের গোড়ের মতো!

বিনয়বাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, কী চমৎকার দ্বীপটি! যেন মুনি-ঋষির সাধনকুঞ্জ! এখানে ভয়ানক কিছু দেখবার আশাই করা যায় না!

বিমল বললে, দিনের আলো বড় কপট! ভয়াবহকেও অনেক সময়ে সুন্দর করে দেখায়।

কুমার বললে, বাইরের খোলস অনেক সময়ে চোখে ধাঁধা দেয়। সুন্দর মৌমাছিকে দেখলে কে বলবে যে, তার ভেতরে বিষাক্ত হুল আছে?

এমন সময়ে ইস্টিমার থেকে মেগাফোনে ইনস্পেকটরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল–ইস্টিমার আর এগুতে পারবে না, এখানে জল বেশি নেই।

বিমল চেঁচিয়ে বললে, বেশ, আর এগিয়ে যাওয়ার দরকার নেই, এইখানেই নোঙর ফেলা যাক।

দ্বীপ সেখান থেকে একশো হাতের ভেতরেই।

কমল বললে, ওই ভদ্রলোক কিন্তু এখনও সেইভাবে সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছেন!

কুমার বললে, বোধহয় আমরা কি করি তাই দেখছেন।

বিমল বললে, কিংবা কি করে আমাদের তাড়ানো যায় তাই ভাবছেন।

বিনয়বাবু বললেন, কিন্তু ওকে দেখলে তো আমার চেয়ে বিপদজনক বলে মনে হয় না!

বিমল বললে, হ্যাঁ, দিনেরবেলায় উনি এই দ্বীপের মতোই নিরীহ! কিন্তু রাত্রে বিপরীত মূর্তি ধারণ করেন! এইবার দ্বীপে নামবার ব্যবস্থা করা যাক, কী বলেন? ইস্টিমারের সঙ্গে দু-খানা বোট আছে, তাতে সিপাইরা আর ইনস্পেকটার থাকবেন। আমরা মোটরবোটেই যাব!

সবাই যখন দ্বীপের ওপরে গিয়ে উঠল, দুপুরের রোদ তখন অত্যন্ত উজ্জ্বল-অধিকাংশ ঝোপঝাপের ভেতরে পর্যন্ত নজর চলে।

দ্বীপের মধ্যে কোনওরকম নতুনত্ব নেই-চারিদিকে গাছপালা জঙ্গল ঝোপঝাপ, মাঝে মাঝে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ, মাঝে-মাঝে ছোট-বড় মাঠ।

বিমল বললে, ইনস্পেকটর বাবু, আপনার সেপাইদের বন্দুক তৈরি রাখতে বলুন! ইনস্পেকটর বাবু হেসে বললেন, যত সব গাঁজাখোরের কথা শুনে আমরা এসেছি বটে, কিন্তু এখানে তো ভয় পাওয়ার কিছুই দেখছি না! কোথায় মশাই আপনাদের কুম্ভকর্ণ? এখনও ঘুমোচ্ছে নাকি?

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, হতে পারে। হয়তো শেষ পর্যন্ত আমরা তার টিকিটিও আবিষ্কার করতে পারব না!

তাহলে এখানে এত তোড়জোড় করে এসে কি লাভ হল?

আমরা এসেছি জনরব সত্য কিনা জানবার জন্যে! জনরব যদি মিথ্যে হয়, তবে ফিরে গিয়ে সেই রিপোর্ট দেবেন।

জনরব কি মশাই? কুম্ভকর্ণকে তো আপনারাও দেখেছেন বললেন! তারপর হাতির মতো বড় ডালকুত্তা, বাঘের মতো বড় বিড়াল, কত আজগুবি গল্পই যে শুনলুম!

কাল রাতে নদীর মাঝখানে যে অমানুষিক কণ্ঠস্বর আপনারা শুনেছেন সেটাও তো আমাদের বানানো নয়?

ইনস্পেকটর একটু যেন শিউরে উঠলেন এবং আর কোনও কথা বললেন না।

যে-পথ ধরে সবাই চলেছে, হঠাৎ তার মোড় ফিরেই দেখা গেল, সামনেই একখানা বাংলোর মতো ছোট একতলা মেটেবাড়ি, ওপরে পাতার ছাউনি।

বারান্দায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন সেই বুড়ো ভদ্রলোক।

সকলে যখন বাড়ির কাছে গিয়ে উপস্থিত হল, বুড়ো ভদ্রলোকটি দুই পা এগিয়ে এলেন। একবার সকলের মুখের ওপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে শান্ত হাসি হাসতে-হাসতে বললেন, এত সেপাই-শান্ত্রী নিয়ে আপনারা কোন রাজ্য জয় করতে যাচ্ছেন?

বিমল এগিয়ে গিয়ে বললে, আমরা দিগ্বিজয়ে বেরুইনি। খালি এই দ্বীপটা খুঁজতে এসেছি।

কেন?

এখানে এমন কিছু দেখেছি যা অন্য কোথাও দেখা যায় না।

বলেন কী মশাই? আমি এখানে বাস করি, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই তো দেখিনি!

এমন সময়ে ইনস্পেকটর তাঁর সুমুখে গিয়ে বললেন, আপনার নাম কী?

ধরণীকুমার মজুমদার।

এই নির্জন দ্বীপে আপনি কি করেন?

আমি সন্ন্যাসী নই বটে, কিন্তু সংসার ত্যাগ করেছি। এখানে বসে পরকালের চিন্তা করি।

আপনার সঙ্গে আর কে আছে?

একজন পুরোনো চাকর।

কোথায় সে?

ধরণী মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, হরিদাস!

ঘরের ভেতর থেকে আর একটি অতিশয় নিরীহের মতো দেখতে প্রাচীন লোক বেরিয়ে এল।

ইনস্পেকটর তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে বললেন, ধরণীবাবু, আপনার বাড়ির ভেতরটা আমরা একবার দেখব।

স্বচ্ছন্দে।

কিন্তু সেখানেও নতুন কিছু আবিষ্কার করা গেল না। আসবাবপত্তর খুবই কম।

বিমল শুধোলে, আপনার একখানা মোটর-বোট আছে না?

ধরণী বললেন, আছে। দেখতে চান তো ওইদিকে নদীর ধারে গেলেই দেখতে পাবেন।

বিমল বললে, না। আজ অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। কাল আমরা সারা দ্বীপটা একবার ভালো করে ঘুরে দেখব, আশা করি আপনি আমাদের সাহায্য করবেন?

নিশ্চয়ই করব। কিন্তু আগে থাকতেই বলে রাখছি, এখানে বনজঙ্গল ছাড়া দেখবার কিছুই নেই।

বিমল তাঁর কাছে গিয়ে খুব চুপিচুপি শুধোলে, বনজঙ্গলের ভেতরে গিয়ে দু-একটা হাতির মতো বড় ডালকুত্তা আর বাঘের মতো বড় বিড়ালও খুঁজে পাওয়া যাবে না?

ধরণী যেন কিছুই বুঝতে না পেরে বিমলের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন!

আর তালগাছ সমান উঁচু মানুষ?

আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? বলেই ধরণী হা-হা করে অট্ট হাস্য করে উঠলেন! সে অট্টহাস্য বিমল ও কুমার আগেই শুনেছিল-গেলবারে দ্বীপের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময়ে।

—— —-

কমল সেদিন রামহরিকে ধরে বসেছিল, তাকে একটা নতুন রান্না খাওয়াতে হবে!

রামহরি যত বলে, সুমুদুরের জলে ডোঙায় বসে কি নতুন রান্না খাওয়ানো চলে ভাই?

কমল ততই বলে, পাকা রাঁধিয়ে আকাশে উড়েও হাতের বাহাদুরি দেখাতে পারে! রামহরি, তুমি তাহলে কোনও কর্মের নও!

তার রন্ধন নিপুণতার ওপরে কেউ কৌতুকছলে ঠাট্টা করলেও রামহরি সহ্য করতে পারত না। অতএব সবাই যখন গিয়েছিল দ্বীপে বেড়াতে, রামহরি তখন ছিল নৌকোয় বসে মাছ ধরতে ব্যস্ত।

এবং আজ রাত্রে সে যে নতুন রান্না কমল ও আর সবাইকে খাওয়ালে, তার নাম রেখেছিল সে মুখবন্ধ!

রান্নাটি কমলের এতই ভালো লেগেছিল যে, মনের ভাব আর ভাষায় প্রকাশ করতে পারলে না!

বিনয়বাবু প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে মস্ত এক বক্তৃতা দিয়ে শেষটা বললেন, এটা কোনদেশি রান্না বিমল?

বিমল বললে, তা আমি জানি না। তবে বিলিতি মতে একে মাছের রোস্ট বলেও ডাকা যায়।

আহারাদির পর যখন শয়নের ব্যবস্থা হচ্ছে, তখন কুমার বললে, দ্বীপটা স্বচক্ষে দেখে আমি কিন্তু হতাশ হয়েছি। মনে হচ্ছে, আমাদের খালি কাদা ঘেঁটে মরাই সার হল!

বিমল বললে, আমি কিন্তু এখনও হতাশ হইনি! আমি কালকের জন্যে অপেক্ষা করছি। হয়তো নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারব!

বিনয়বাবু সারাদিন দ্বীপের কথা নিয়ে কোনও মত প্রকাশ করেননি। এখন তিনি হঠাৎ সবাইকে বিস্মিত করে বললেন, দ্বীপে গিয়ে আমি কিন্তু একটা আশ্চর্য আবিষ্কার করেছি।

কুমার বললে, আপনি! কী আবিষ্কার?

ধরণীবাবুর বাংলোর পিছনে আছে একটা জলাভূমির মতো জায়গা। সেখানে ভিজে মাটির ওপরে আমি এমন কতকগুলো পায়ের দাগ দেখেছি, যা মানুষের পায়ের দাগের মতোই, কিন্তু মানুষের পায়ের দাগের চেয়ে বারো-তেরো গুণ বেশি বড়!

কমল সবিস্ময়ে বললে, কিন্তু আপনি এতক্ষণ তো এ কথা বলেননি!

বিমল হাসতে-হাসতে বললে, বিনয়বাবু বলেননি, আমিও বলিনি। সে পায়ের দাগগুলো আমিও দেখেছি! বলেই সে একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল এবং বিনয়বাবুও তার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করলেন!

কুমার ও কমল একবার পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে, তারপর যে-যার জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঠিক সেই সময়েই সকলকার কানে এক অদ্ভুত স্বর জেগে উঠলঃ

ঘোঁ-ঘট ঘট, ঘোঁ-ঘট ঘট, ঘোঁ- ঘট ঘট!
চলো রে চলো, চটপট চলো, দি চম্পট!

সকলেই সচমকে ধড়মড় করে আবার উঠে বসল! গতকল্য গভীর রাত্রে নদীর বক্ষে এই অমানুষিক কণ্ঠস্বরই শোনা গিয়েছিল!

সকলেই বোটের ধারে ঝুঁকে পড়ে মুখ বাড়ালে! কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, কিছুই দেখা গেল না এবং কিছুই দেখবার উপায় নেই!

বিনয়বাবু বললেন, বিমল, আমরা মঙ্গল গ্রহেও গিয়েছি, কিন্তু সেখানেও এমন আশ্চর্য কণ্ঠস্বর শুনিনি!

বিমল টর্চের কল টিপে আলো জ্বেলে বললে, নদীর জল এক জায়গায় খুব তোলপাড় হচ্ছে,-যেন কেউ ওখানে বিরাট দেহ নিয়ে সবে ডুব দিয়েছে। কিন্তু আর কিছুই দেখা যায় না!

এমনসময়ে খানিক তফাতে ওপর থেকে আবার অন্য একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেলঃ

কিচিরমিচির কিচিরমিচির কচমচ মচ কচমচমচ।
বুকের কাছে করছে কেমন খচমচ খচ খচ- মচখচ।
মানুষ-ভূতে কালকে পাবে,
কলকাতা কি শালকে যাবে,
কাটবে মগজ চালিয়ে ছুরি কচুকাটা কচকচকচ।

টর্চের আলো শূন্যের অন্ধকার যুঁড়ে খুঁজে পেলে খালি শূন্যতাই!

কমল উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, বিংশ শতাব্দীতেও তাহলে দৈববাণী হয়?

কুমার একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, কিন্তু এ দৈববাণীর জন্ম বোধহয় ওই গাছগুলোর ভেতর থেকেই!

সকলে দেখলে, নদীর জলের ওপরে ঘন শাখাপল্লব নিয়ে একটা মস্তবড় গাছ ঝুঁকে। পড়েছে এবং তারই ডালপাতাগুলো সশব্দে দুলে-দুলে উঠছে-যেন তার ভেতরে কোনও জীব লুকিয়ে এদিকে-ওদিকে আনাগোনা করছে।

রামহরি বন্দুক নিয়ে বললে, খোকাবাবু, আন্দাজে-আন্দাজে একটা গুলি ছুড়ব নাকি?

বিমল বললে, না রামহরি, কেউ তো এখনও আমাদের সঙ্গে কোনও শত্রুতা করেনি। আমরাই বা আগে থাকতে অস্ত্র ব্যবহার করব কেন?

এমন সময়েই ইস্টিমারের সার্চলাইট অন্ধকারের ওপর দিয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল, সঙ্গে-সঙ্গে নদীর জলের তোলপাড় শব্দ এবং গাছের ডালপালার মড়মড়ানি একেবারে থেমে গেল!

কুমার বললে, এখানে যেসব কবি কবিতা শোনায়, তারা স্বশরীরে দেখা দিতে রাজি নয় দেখছি!

বিনয়বাবু বললেন, কিন্তু কে ওরা? আমাদের ভয় দেখাচ্ছে, না সাবধান করে দিচ্ছে?

ইস্টিমার থেকে চেঁচিয়ে ইনস্পেকটর বললেন, এসব কী কাণ্ড মশাই!

বিমল বললে, যা শুনছেন আর দেখছেন, তা কি গাঁজাখোরের কল্পনা বলে মনে হচ্ছে?

কিন্তু কেউ বোধহয় ভয় দেখাবার জন্যে আমাদের ঠাট্টা করছে। এটা তো আর সত্যযুগ নয় যে, জল আর গাছ কথা কইবে!

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ঠাট্টা করছে কে?

নিশ্চয় সেই বুড়ো যাদুকরটা! আমি কালই ধরণীকে গ্রেপ্তার করব!

কি অপরাধে? সে তো এখনও আমাদের কোনও অনিষ্ট করেনি!

সরকারি লোকদের ভয় দেখানোর মজাটা তাকে টের পাইয়ে দেব।

দ্বীপের ভেতর থেকে হা-হা-হা-হা করে কে ভীষণ অট্টহাসি হেসে উঠল! এ সেই হাসি,- যে হাসি সবাই আজই ধরণীর কণ্ঠে শুনে এসেছে, কিন্তু এখন তার চেয়ে ঢের-বেশি তীব্র ও ভীতিপ্রদ!

ইনস্পেকটর খাপ্পা হয়ে বললেন, সেপাই, সেপাই! সবাই বন্দুক নাও! বোট ভাসাও! আজই আমি বুড়োকে গ্রেপ্তার করব!

বিমল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না, না, আজ আর গোলমালে কাজ নেই! আজ খালি দেখুন, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়! নইলে সব পণ্ড হবে!

অট্টহাসি থামল না, কিন্তু ধীরে-ধীরে দূরে চলে যেতে লাগল।

বিনয়বাবু বললেন, ধরণী পাগল নয়তো?

অনেক দূর থেকে যথাক্রমে নদীর জলে ও গাছের ওপরে উঠছে সেই আশ্চর্য ঘোঁ ঘটঘট ও কিচিরমিচির শব্দ।

কুমার বললে, ওই হাসি আর শব্দ দুটো যখন একসঙ্গে হচ্ছে, তখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে তিনটে আলাদা-আলাদা জীব আছে!

বিনয়বাবু বললেন, তাহলে এই তৃতীয় জীবটি কে? দ্বীপে গিয়ে আমরা তো কেবল ধরণী আর তার চাকর হরিদাসের দেখা পেয়েছি!

বিমল ভাবতে-ভাবতে বললে, কুমার, তুমি ঠিক ধরেছ! হা বিনয়বাবু, এই তৃতীয় জীবটি কে, এখন সেইটেই আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।

ক্রমে সমস্ত কণ্ঠস্বর থেমে গেল, নির্জনতা সজাগ হয়ে উঠল এবং রাত্রির অন্ধ স্তব্ধতাকে সংগীতময় করে তুলতে লাগল সাগরসঙ্গমে উচ্ছ্বসিত নদীর কলধ্বনি! সে অশ্রান্ত ধ্বনি যেন সুদূর অসীমের স্মৃতিকে কানের কাছে ডেকে আনে! সে ধ্বনি যেন নিকটের যা-কিছুকে সুদুর অসীমতায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়!

বিমল বাঘাকে বোটের বাইরে ঠেলে দিয়ে বললে, যা বাঘা, বাইরে যা! আমরা এখন একটু ঘুমোব, তুই পাহারা দেয়।

বাঘা যেন বিমলের কথা বুঝতে পারলে! সে বোটের ধারে গিয়ে কান খাড়া করে বসে রইল!

বোটের তলায় নদীর করাঘাতের শব্দ শুনতে-শুনতে সবাই একে একে ঘুমিয়ে পড়ল!

এমনকী শেষটা বাঘার চোখও ঘুমে ঢুলে পড়ল!

গভীর নিশীথিনীর কালো শাড়ির আঁচল সরিয়ে বেরিয়ে এল যেন রুগ্ন চাঁদের অত্যন্ত হলদে মুখ! তাকে এই বিজনতার মধ্যে দেখলে ভয় হয়, চিতার পাশে খাটে-শোয়ানো মড়ার মুখ মনে পড়ে যায়।

আচম্বিতে বাঘা ভয়ানক জোরে চেঁচিয়ে উঠল এবং কমল জেগে ধড়মড় করে উঠে বসল!

কমলের মনে হল, সে বোটের ভেতরে আছে বটে, কিন্তু বোট যেন আর নদীগর্ভে নেই! কী অদ্ভুত অনুভূতি!

হঠাৎ বাঘা ভয় পেয়ে বোটের ওপর থেকে লাফ মারলে! অনেক উঁচু থেকে জলে লাফিয়ে পড়লে যেরকম শব্দ হয়, সেইরকম একটা শব্দ হল!

ইতিমধ্যে আর সকলেও জেগে উঠল! তাদেরও মনে হল, তারাও যেন কারুর মাথার ওপরে ঝকার ভেতরে মোরগের পালের মতো বসে রয়েছে।

বিমল তাড়াতাড়ি কামরার বাইরে মুখ বাড়িয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে বিস্মিত চোখে দেখলে, তারা দ্বীপের গাছের সারের চেয়েও আরও ওপরে উঠেছে এবং অনেক নীচে আলো আঁধারির মধ্যে চিকচিক করছে নদীর জল!

একটা নিশ্বাস ফেলে, কঠিন হাস্য করে বিমল বললে, বোধহয় সেই কুম্ভকর্ণই বোট শুদ্ধ আমাদের মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে!

.

দশম পরিচ্ছেদ । মানুষ-'মনুমেন্ট'

সেই রুগ্ন চাঁদের হলদে মুখ! মিটমিটে আলোতে পৃথিবীর কিছুই ভালো করে নজরে পড়ে না! বিমল বোটের তলায় উঁকিঝুঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না। বোটের তলায় রয়েছে কেবলই অন্ধকার কষ্টিপাথরের মতো কালো আর নিরেট!

বোটের ভেতরে আর সবাই তখন নির্বাক ও বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বসে আছে, বোধহয় তাদের মাথার ভেতরে তখনও বিমলের সেই অসম্ভব কথাগুলোই বারংবার ঘোরাফেরা করছে সেই কুম্ভকর্ণই বোটশুদ্ধ আমাদের মাথায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

বোটের নীচের দিকটা দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বিমল আবার বললে, না, আর কোনও সন্দেহ নেই! কুম্ভকর্ণই আজ ঝকামুটে হয়েছে। তার আঁকা হয়েছে এই বোট, আর বোটের মধ্যে আছি আমরা!

বিনয়বাবুর মুখে অস্ফুট স্বরে শোনা গেল, অসম্ভব!

বিমল শুকনো হাসি হেসে বললে, হ্যাঁ, অসম্ভবই বটে! কিন্তু অসম্ভবের দেশে অসম্ভবও সম্ভব হয়। জলে সাঁতার কাটা যার একমাত্র কর্তব্য, সেই বোট পাখিও নয়, এরোপ্লেনও নয় যে শুন্য দিয়ে উড়ে যাবে! বিনয়বাবু, চেয়ে দেখুননদীর জল এখন কত দূরে!

সকলে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখলে, নদীর জলে আলোর ঝিকিমিকি বহু দূরে সরে গিয়েছে এবং ক্রমে আরও দূরে সরে যাচ্ছে! জলতরঙ্গের কলকল্লোলও আর শোনা যায় না!

বিমল বললে, আমাদের মাথায় নিয়ে কালাপাহাড় এখন জমির ওপর দিয়ে হাঁটছে!

বিনয়বাবু উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, কোথায় যাচ্ছে সে?

এর উত্তর সেইই জানে। কলকাতায় আঁকায় চড়ে রামপাখিরা আসে আমাদের জন্যে। এখানে আঁকায় চড়ে আমরা যাচ্ছি হয়তো ধরণীর বাসায়!

এতক্ষণে রামহরির হুঁস হল। সে হাউমাউ করে বলে উঠল, ও খোকাবাবু! ওই ধরণী কি পিশাচ? আমাদের কেটে খানা খাবে নাকি?

কুমার বলে উঠল, বন্দুক নাও বিমল! বোটের তলার দিকে গুলি-বৃষ্টি করো!

বোটের তলায় কে আছে, ভগবানই জানেন। কিন্তু যে-জীবই থাকুক, সে যে কুমারের কথা শুনতে পেলে ও বুঝতে পারলে, তৎক্ষণাৎ তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কারণ কুমারের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই বোটখানা ধরে কে এমন ঘনঘন বিষম ঝাঁকুনি দিতে লাগল যে সকলেই তার ভেতরে চারিদিকে ছিটকে পড়ল! সে ভয়ানক ঝাঁকুনি আর থামে না– সকলেরই অবস্থা হল কুলোর মধ্যে ফুটকড়াইয়ের মতো, গতর গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার জোগাড় আর কি! আঁকুনি যখন থামল, বোটের ভেতরে সবাই তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে!

—— ——

একে-একে যখন তাদের আবার জ্ঞান হল, তখন রাত কি দিন প্রথমে তা বোঝা গেল না! চারিদিকে না-আলো না-অন্ধকার, সন্ধ্যার মুখেই পৃথিবীকে দেখতে হয় এইরকম আবছায়া মায়া-মাখা রহস্যময়!

সামনেই দেখা যাচ্ছে একটা দরজার মতো, বিমলের চোখ সেই ফাঁকা জায়গাটুকু দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল কিন্তু সেখানেও আলো খুব স্পষ্ট নয়।

বিমল ওঠবার চেষ্টা করলে, পারলে না! তার সর্বাঙ্গ দড়ি দিয়ে বাঁধা।

কুমার বললে, বন্ধু, আমরা বন্দি।

বিমল বললে, হুঁ। কিন্তু কার বন্দিধরণীর না কুম্ভকর্ণের।

বিনয়বাবু বললেন, বোধহয় ধরণীর। বিমল, ভালো করে তাকালেই বুঝতে পারবে, আমরা একটা অন্ধকার ঘরে বন্দি হয়ে আছি। এর দরজাটা সাধারণ মানুষ ঢোকবারই উপযোগী, এর ভেতর দিয়ে তোমাদের ওই কুম্ভকর্ণ কিছুতেই দেহ গলাতে পারবে না। সুতরাং যে আমাদের এ ঘরে এনে রেখেছে তার দেহ তোমার- আমার চেয়ে বড় হতে পারে না।

বিমল বললে, কিন্তু আমরা কোথায় আছি? বাহির থেকে গাছপালার আওয়াজ আসছে- একটা কাকও কা-কা করছে! মনে হচ্ছে এখন দিনেরবেলা! কিন্তু আলো এত কম কেন?

কমল বললে, বাইরে যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেখানে আলো আসছে যেন ওপর থেকেই, আমরা বোধহয় কোনও উঠানওয়ালা বাড়ির একতলার ঘরে বন্দি হয়ে আছি।

বিমল বললে, কিন্তু দ্বীপে এমন কোনও উঁচু বাড়ি থাকলে কালকেই আমাদের নজরে পড়ত। বিনয়বাবু, আমরা বোধহয় জমির নীচে কোন পাতালপুরিতে বন্দি হয়েছি।

হঠাৎ রামহরি আর্তস্বরে বলে উঠল ওই! আবার সেই শব্দভূত!

সকলে কান পেতে শুনলে, বাইরে আবার কোথায় সেই পরিচিত কিচিরমিচির কিচিরমিচির শব্দ হচ্ছে-সঙ্গে-সঙ্গে ডাল-পাতা নড়ে ওঠারও শব্দ, কে যেন গাছের এ-ডাল থেকে ও ডালে লাফালাফি করছে।

তারপরেই সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে শোনা গেল–

নেইকো হেথায় রম্ভা-টম্ভা–
আছে অষ্টরম্ভা,
লম্বা লম্বা লম্ফ মেরে
জলদি দে রে লম্বা।
হুমড়োমুখো ধুমড়ো বিড়াল,
আকাশমুখো শৈত্য।
মুখ বাড়িয়ে কুত্তা ধরে।
বটের ডালের পক্ষী,
পালাও ভায়া! কেমন করে
সইবে এ-সব ঝক্কি!

বিমল অভিভূত স্বরে বললে, সেই কণ্ঠস্বর! আবার আমাদের সাবধান করে দিচ্ছে!

কুমার বললে, অতিকায় বিড়াল, কুকুর, দৈত্যসকলকার কথাই ও বলছে! কে ও বিমল, অমন করে লুকিয়ে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে থাকে কেন, বিপদের আগেই সাবধান করে দেয় কেন, আর কবিতাতেই বা কথা কয় কেন?

বিমল বললে, আর একটা কণ্ঠস্বরও আমরা শুনেছি নদীর জলে সেই ভীষণ অমানুষিক কণ্ঠস্বর! এখানে জল নেই বলেই বোধহয় সে গলার আওয়াজটা আর শোনা যাচ্ছে না!

বিনয়বাবু বললেন, চুপ-চুপ, ওই শোনো!

আবার শব্দ হতে লাগল–কিচিরমিচির! আবার গাছের ডালে-ডালে লাফালাফির শব্দ! কিচিরমিচির শব্দ আরও কাছে এগিয়ে এল। তারপর শোনা গেল, অত্যন্ত দুঃখে যাতনায় যেন ভেঙে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে কে বলছে–

অনেক দিনের রূপকথা ভাই,
বহুকালের গল্প,
ছিলাম যেন মাটির মানুষ,
সুখ ছিল না অল্প।
রাঙা-রাঙা খোকা-খুকি।
খেলত আমার বক্ষে,
টুকটুকে মোর বউটি সদাই
হাসত মুখে-চক্ষে।
আজ অদৃষ্ট শক্ত করে।
আমায় যখন বাঁধছে–
হায়রে তারা কোথায় বসে।
আমার তরেই কাঁদছে।

হঠাৎ একটা নতুন কণ্ঠে উচ্চস্বরে শোনা গেল, হা, হা, হা, হা! কি হে কবি, এখনও কবিতা ভোলেনি! হা-হা-হা-হা! এ ধরণীর হাসি!

কবিতা আর শোনা গেল না! খালি গাছের ডাল-পাতার শব্দ হল! তারপরেই আর এক শব্দ! কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে! বিমল ও কুমার পরস্পরের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলে। দরজার কাছটা অন্ধকার করে একটা মূর্তি এসে দাঁড়াল ধরণী।

খানিকক্ষণ সেইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ধরণী ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলে। তারপর সহাস্যে বললে, এই যে বন্ধুগণ! ধরণীর শ্রেষ্ঠ শয্যা ভূমিশয্যায় শুয়ে আছ, আশা করি

বিশেষ কোনও কষ্ট হচ্ছে না? কেউ কোনও জবাব দিলে না। ধরণী তেমনি হাসতে হাসতে বললে, হাতির মতো বড় ডালকুত্তা দেখতে চেয়েছিলে, শীঘ্রই তাকে দেখতে পাবে। আর বাঘের মতো বড় বিড়ালকে তো তোমরা নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছ! আর তালগাছের মতন উঁচু মানুষকে কাল অন্ধকারে তোমরা ভালো করে দেখতে পাওনি নয়?

বিমল বললে, কে সে?

ধরণী বললে, দেখছি এখনও তোমার কৌতূহল দূর হয়নি! সে কে জানো, আমার চাকর হরিদাসকে কাল দেখেছ তো? সে তার ছোট ভাই রামদাস-তোমরা যার নাম রেখেছ কুম্ভকর্ণ!

বিমল সবিস্ময়ে থেমে-থেমে বললে, হরিদাসের ছোট ভাই রামদাস!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কুম্ভকর্ণ নয়, আর কেউ নয়, হরিদাসের ছোট ভাই রামদাস! ভাবছ, কেমন করে রামদাস এত বড় হল? হা, হা, হা, হা! তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে অত্যন্ত কঠোর ও গম্ভীর স্বরে ধরণী বললে, কেন তোমরা আমাকে জ্বালাতন করবার জন্যে এখানে এসেছ? মূর্খ মানুষদের মুখ বন্ধ রাখবার জন্যে আমি এত দূরে পৃথিবীর একপ্রান্তে এসে অজ্ঞাতবাস করছি, কিন্তু এখানেও তোমাদের মুখতা আর অন্যায় কৌতূহল থেকে মুক্তি নেই? যত-সব তুচ্ছ জীব, কতটুকু শক্তি তোমাদের? এসেছ আমার সাধনায় বাধা দিতে? জানো, আমি একটা আঙুল নাড়লে তোমরা এখনি ধুলোয় মিশিয়ে যাবে?ধরণী জ্বলন্ত চক্ষে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল অতিশয় উত্তেজিত ভাবে!

বিনয়বাবু শান্ত কণ্ঠে বললেন, ধরণীবাবু, আমাদের আপনার শত্রু বলেই বা ধরে নিচ্ছেন। কেন? আমরা তো আপনার সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্যে এখানে আসিনি, আমরা এসেছি শুধু এখানকার অদ্ভুত ঘটনাগুলো স্বচক্ষে দেখবার জন্যে!

ধরণী আরও বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে আরও বেশি চেঁচিয়ে বললে, দেখবার জন্যে, না মরবার জন্যে? তোমরা আমার বিড়ালকে হত্যা করেছ, তোমাদের আমি ক্ষমা করব না!

বিমল বললে, আপনার বিড়ালকে মেরেছি একলা আমি! আমার অপরাধে ওঁরা কেন। শাস্তি পাবেন? ওঁদের ছেড়ে দিন!

ছেড়ে দেব? হা-হা-হা-হা! ছেড়ে দেবই বটে! ওদের ছেড়ে দি, আর ওরা দেশে গিয়ে সারা পৃথিবীর লোককে নিয়ে আবার এখানে ফিরে আসুক! সবাই আমার গুপ্তকথা জানুক। জানো বাপু, যে আমার গুপ্তকথা জেনেছে তার আর মুক্তি নেই!

আপনার কি গুপ্তকথা আমরা জানতে পেরেছি?

কিছু-কিছু জানতে পেরেছ বইকী! আসল কথা এখনও জানতে পারোনি বটে, তবে তোমাদের কাছে তা বলতে এখন আমার আর আপত্তিও নেই! তোমরা তো আর দেশে ফিরে যাবে না!

ঘরের কোণে একটা টুল ছিল ধরণী তার ওপরে গিয়ে বসল। তারপর বলতে লাগল, এই নির্জনে একলা বসে আমি সাধনা করি। কি সাধনা করি জানো! পুরাতন পৃথিবীকে নতুন রূপ, নতুন শক্তি দেওয়ার সাধনা! মানুষ বড় ছোট্ট, বড় দুর্বল জীব। তার মস্তিষ্ক অন্য সব জীবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু দেহ হিসাবে তার চেয়ে বৃহৎ আর বলবান প্রাণী আছে অনেক। কাজেই মানুষকে কি করে আরও বড় ও শক্তিমান করে তোলা যায় প্রথমে সেইটেই হল আমার ধ্যান ধারণা। কেমন করে সে ধ্যান-ধারণা সফল হল, তোমাদের কাছে সে-কথা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বলে লাভ নেই। কারণ সাধারণ মানুষের গোবর-ভরা মাথায় তা ঢুকবে না। তবে সামান্য দু-একটা ইঙ্গিত দিচ্ছি শোনো। Glands বা গ্রন্থিদের নাম শুনেছ তো? এই গ্রন্থিদের রসেই মানুষের দেহ টিকে থাকে। গুটি-পাঁচেক গ্রন্থি দেহের ভেতরে রস-সঞ্চার করে; আর তাদের মধ্যে প্রধান তিনটি গ্রন্থির নাম হচ্ছে Thyroid, Adrenal ও Pituitary। প্রথমটির অবস্থান মানুষের কণ্ঠে, দ্বিতীয়টির মূত্রাশয়ে আর তৃতীয়টির মস্তিষ্কে। এইসব গ্রন্থির হের-ফেরে মানুষের দেহের অদল-বদল হয়। ধরো Thyroid গ্রন্থির কথা। যে-শিশুর দেহে এই গ্রন্থি বিকৃত অবস্থায় থাকে–

বিনয়বাবু ধরণীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, তার মস্তিষ্ক আর কঙ্কালের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। ত্রিশ বছর বয়সেও তার দেহ আর বুদ্ধি হয় খোকারই মতন। আমি এ সব জানি ধরণীবাবু! আবার Pituitary গ্রন্থি অতিরিক্ত রস ঢাললে মানুষের দেহের বাড়ও অতিরিক্ত রকম হয়ে ওঠে–কেউ হয় আশ্চর্য রকম মোটা; আবার কেউ বা হয় আট-দশ ফুট লম্বা! গ্রন্থি নিয়ে মিছামিছি লেকচার না দিয়ে আপনি কাজের কথা বলুন,–যতটা ভাবছেন আমরা ততটা মূর্খ নই!

ধরণী একটু থতমত খেয়ে অল্পক্ষণ বিনয়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, তাহলে তোমাদের ঘটে একটু-আধটু বুদ্ধি আছে দেখছি! তবে আমার পরীক্ষার আসল পদ্ধতিটা তোমাদের কাছে আর খুলে বলা হবে না। যদিও ওই দেহ নিয়ে তোমরা আর এ ঘরের বাইরে যেতে পারবে না, তবু সাবধানের মার নেই!

কুমার বললে, দেহ নিয়ে বাইরে বেরুতে পারব না! তার মানে?

ধরণী হেসে উঠে বললে, মানে? মানে নিশ্চয়ই একটা আছে! হ্যাঁ, শীঘ্রই তোমাদের চেতনা থাকবে বটে, কিন্তু তোমাদের দেহগুলো পঞ্চভূতে মিশিয়ে যাবে!

সকলে মহা বিস্ময়ে এই ধাঁধার কথা ভাবতে লাগল! চেতনা থাকবে, কিন্তু দেহ থাকবে না? আশ্চর্য! ভয়ানকও বটে!

ধরণী বললে, তারপর শোনো। আমার পরীক্ষা-পদ্ধতির কথা আর বলব না বটে, কিন্তু পরীক্ষার ফলের কথা তোমাদের কাছে বলতে ক্ষতি নেই। আমি এমন সব বিশেষ ঔষধ বা খাবার আবিষ্কার করেছি, দ্রব্যগুণে যা গ্রন্থিদের রস উৎপাদনের ক্ষমতা কল্পনাতীতরূপে বাড়িয়ে তোলে। ওই আবিষ্কারের দৌলতে আমি এখন মানব-দানব সৃষ্টি করতে পারি!

বিমল বললে, যেমন হরিদাসের ভাই রামদাস?

হ্যাঁ। রামদাস জন্মাবার পর থেকেই মানুষ হয়েছে আমার আবিষ্কৃত খাবার খেয়ে। সে। যখন তিনমাসের শিশু, তখনি তার দেহ লম্বায় হয়ে উঠেছিল তিন ফুট! তার অতি বাড় দেখে পাড়ার লোক এমন কৌতূহলী হয়ে উঠল যে, আমাকে এই নির্জন দ্বীপে পালিয়ে আসতে হল! কেবল রামদাস নয়, একটা বিড়াল ও একটা কুকুরকেও আমি আমার খাবার খাইয়ে বাঘ আর হাতির মতো বড় করে তুলেছি। এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। আদিম যুগের হাতি, বাঘ, সিংহ আর ষাঁড়রা এখনকার চেয়ে ঢের বড় হত কেন? কোমোডোর গোসাপরা এখনও বড়-বড় কুমিরেরও চেয়ে মস্ত হয় কেন? কেবল ওই গ্রন্থির অতিরিক্ত রসের মহিমায়! এদিকে আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। আমি এখন সুদিনের অপেক্ষায় বসে আছি।

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের সুদিন?

ধরণী বিকট উল্লাসে চিৎকার করে বললে, আমি এই ক্ষুদ্র দুর্বল মানুষের পৃথিবী জয় করব! আর বছর-বারো পরে আমার দানব-বাহিনী নিয়ে তোমাদের মতো জ্যান্ত পুতুলের খেলাঘর আক্রমণ করব, ধীরে-ধীরে একালের সমস্ত মানুষ-জাতিকে লুপ্ত করে দিয়ে দুনিয়ার সর্বশক্তিমান সম্রাট হয়ে নতুন এক মহামানবের পৃথিবী গড়ে তুলব! সে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ হবে প্রায় কলকাতার মনুমেন্টের মতন উঁচু, আর প্রত্যেক বাড়ি হবে মিশরের পিরামিডের মতন উঁচু, আর সেখানকার বড়-বড় অট্টালিকা উঁচু হবে দার্জিলিং পাহাড়ের সমান! আমার তৈরি মানুষরা তিন-চারবার পা ফেলে হেঁটেই গঙ্গা আর পদ্মা নদী পার হয়ে যাবে। আমার রামদাস তো এখনও বালক, মাথায় সে আরও কত উঁচু হবে আমিই তা জানি না!

বিনয়বাবু বললেন, পৃথিবীর মানুষ যত ছোট আর দুর্বলই হোক, আপনার ওই রামদাসের মতন একটিমাত্র দানবকে বধ করবার শক্তি তাদের আছে!

একটিমাত্র দানব? মোটেই নয়, মোটেই নয়! আর এক দ্বীপে আমি আমার শিশু দানবদের লুকিয়ে পালন করছি! সেই দ্বীপ থেকে এখানে আসবার সময়েই তো আমার বিড়াল-

বাচ্ছাকে হতভাগা মাঝি-মাল্লারা জলে ফেলে দিয়েছিল! নাজানি সে বাচ্ছাটা আরও কত বড় হতে পারত। তাকেই তোমরা হত্যা করেছ, তোমাদের ও-অপরাধ আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না।

বিমল একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, দানব রহস্য তো বুঝলুম, কিন্তু ছড়া কাটে কারা?

প্রশ্ন শুনেই ধরণী ও-হো-হো-হা-হা-হা করে হেসে যেন গড়িয়ে পড়ল! তারপর অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললে, ছড়া কাটে কারা? ছড়া কাটে কারা? এখনও তাদের দেখতে পাওনি বুঝি? তারা হচ্ছে বাংলাদেশের মাসিকপত্রের দুজন কবি!

বিমল সবিস্ময়ে বললে, কবি!

হ্যাঁ। তারা এমনি যাচ্ছেতাই কবিতা লিখত যে, বাংলা মাসিকপত্রগুলো অপাঠ্য হয়ে উঠেছিল! কত সমালোচক তাদের গালাগাল দিয়েছে, কিন্তু তাদের ভয়ঙ্কর কবিতা লেখার উৎসাহ একটুও কমাতে পারেনি। বাধ্য হয়ে আমি তাদের এখানে এনে ধরে রেখেছি– অবশ্য তাদের দেহকে নয়, তাদের মস্তিষ্ককে!

সে আবার কী?

তোমরা কি এখনকার ইউরোপীয় অস্ত্র-চিকিৎসকদের বাহাদুরির কথা শোনোনি? বাঁদরের দেহের গ্রন্থি কেটে তারা মানুষের দেহের ভেতরে বসিয়ে দিচ্ছে। একজন মানুষের হৃৎপিণ্ড খারাপ হয়ে গেলে কেটে বাদ দিয়ে, তার জায়গায় কোনও সদ্য মৃত মানুষের হৃৎপিণ্ড তুলে বসিয়ে দিচ্ছে। আমি নিজেও ডাক্তারি পাশ করেছি। তাই এসব বিষয় নিয়েও পরীক্ষা করি। মানুষের মস্তিষ্ক জন্তুর মাথায় চালান করলে কি ব্যাপার হয় সেটা দেখবার জন্যে আমার যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। তাই একদিন ওই দুই নাছোড়বান্দা দুষ্ট কবিকে ধরে এনে কি করলুম জানো? করলুম ছোটখাটো একটা অস্ত্রোপচার! একটা কুমির আর একটা হনুমান ধরলুম, তারপর তাদের জানোয়ারি মস্তিষ্ক কেটে বাদ দিয়ে দুই কবির মস্তিষ্ক

কেটে নিয়ে বসিয়ে দিলুম! কিন্তু হতভাগা কবির মস্তিষ্ক! কুমির আর হনুমানের দেহে ঢুকেও কবিতা রচনা করতে ভোলে না! করুক তারা এই অরণ্যে রোদন! কিন্তু বাংলা মাসিকের পাঠকরা আজ বেঁচে গিয়েছে। (পশুর মাথায় মানুষের মস্তিষ্ক চালান করবার এই অদ্ভুত কল্পনার জন্যে আমি এক বিলাতি লেখকের কাছে ঋণী। ইতি-লেখক)

এই ভীষণ কথা যারা শুনলে তাদের মনের ভেতরটা তখন কেমন করছিল, তা জানেন। কেবল অন্তর্যামীই! ধরণী আবার অট্টহাস্য করে বললে, তোমরাও বেশি ভয় পেও না, তোমাদেরও আমি একেবারে মেরে ফেলব না! তোমাদের দেহগুলো নষ্ট হবে বটে, কিন্তু তোমাদের মস্তিষ্ক বেঁচে থাকবে পশুদের মাথার ভেতরে গিয়ে। তবে কোন পশুকে কার মস্তিষ্ক দান করব, সেটা এখনও স্থির করে উঠতে পারিনি। আজ রাত্রেই একটা কোনও ব্যবস্থা করতে পারব বলে বোধ হচ্ছে! হা-হা-হা-হা!

কুমার গর্জন করে বললে, পিশাচ! দুরাত্মা! মনে করছিস আমাদের হত্যা করে তুই নিস্তার পাবি? ইস্টিমারে আমাদের বন্ধুরা আছে তারা তোকে ক্ষমা করবে না!

বিমল শান্তভাবেই বললে, ধরণীবাবু, এখনও আমাদের ছেড়ে দিন, নইলে আপনাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে!

অট্টহাসি হাসতে-হাসতে ধরণী বললে, তোমরা হাসালে দেখছি! আমরা এখন কোথায় আছি জানো? পাতালে! এই পাতালে ঢোকবার পথ এমন গভীর জঙ্গলে ঢাকা আছে, আজ সারাদিন ধরে খুঁজলেও ইস্টিমারের লোকেরা কোনও সন্ধান পাবে না! আজ রাত্রেও যদি ইস্টিমার দ্বীপের কাছে থাকে, তাহলে অন্ধকারে গা ঢেকে রামদাস গিয়ে সেখানাকে জলে ডুবিয়ে দিয়ে আসবে! সুতরাং, বুঝতেই পারছ, মনুষ্য-দেহ ত্যাগ করবার জন্যে তোমরা এখন প্রস্তুত হও! হা-হা-হা! হাসতে-হাসতেই ধরণী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল!

রামহরি হঠাৎ গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল! বিমল হেসে বললে, থামো রামহরি, থামো! অমন শেয়ালের মতো চাচালে ধরণী এখনি এসে তোমার মগজ কেটে নিয়ে হয়তো শেয়ালেরই মাথায় ঢুকিয়ে দেবে!

বিনয়বাবু গম্ভীরভাবে বললেন, না, ঠাট্টা নয় বিমল! যা শুনলুম তা আমাদের পক্ষেও ভয়াবহ, সমস্ত মানুষ-জাতির পক্ষেও ভয়াবহ! এখন কিসে প্রাণ বাঁচে, ভালো করে সেটা ভেবে দেখা দরকার।

বিমল অবহেলা-ভরে বললে, আর মিথ্যা ভাবনা! আছি পাতালপুরীতে বাইরে রামদাসের পাহারা! আমাদের হাত-পা এমন ভাবে বাঁধা যে, নড়বার ক্ষমতাও নেই! বিনয়বাবু, বাঁচবার ভাবনা মিথ্যা!

.

একাদশ পরিচ্ছেদ । বাঘা কি করলে

খানিকক্ষণ কেউই কথা কইবার ভাষা খুঁজে পেলে না।

পাতালপুরীর গর্ভে যেটুকু রোদ এসে পড়েছিল, সেও যেন ভয়ে-ভয়ে ধীরে-ধীরে সরে যাচ্ছে ঘরের ভেতরে দিনের বেলাতেই সন্ধ্যার আভাস ফুটে উঠছে!

বাহির থেকে মাঝে-মাঝে গাছপালার দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কোনও শব্দই ভেসে আসছে না।

কুমার বললে, পৃথিবী আর মঙ্গল গ্রহ জয় করেও শেষটা কি তাহলে ওই বুড়ো ধরণীর হাতে আমাদের হার মানতে হবে?

বিমল বললে, উপায় কী? মরতে তো হবেই একদিন। আজ না-হয় ধরণীই হবে আমাদের যমদূত! জীবনের প্রবল আনন্দ আমরা দুই হাতে লুণ্ঠন করে নিয়েছি সাধারণ মানুষের দশ জন্মের যৌবন আমাদের এক জন্মের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, তোমার আর কি অভিযোগ থাকতে পারে কুমার? এই অতিরিক্ত জীবনের বন্যা আমার যৌবনকে শ্রান্ত করে তুলেছে, আমি এখন ঘুমোতে পেলে দুঃখিত হব না!

বিনয়বাবু বললেন, কিন্তু এ তো চিরনিদ্রা নয় বিমল, এ যে জীবন্ত মৃত্যু! আমাদের মস্তিষ্ক নিয়ে ধরণী কি করতে চায়, শুনলে তো!

বিমল চিন্তিত মুখ বললে, হা, ওই কথা ভেবেই মাঝে-মাঝে মন আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠছে! মানুষের দেহ থাকবে না, কিন্তু মানুষের প্রাণ থাকবে কিন্তু সে প্রাণের মূল্য কী? কারণ এক হিসাবে মস্তিষ্কই হচ্ছে মানুষের প্রাণ! কিন্তু বিনয়বাবু, এও কি সম্ভব?

বিনয়বাবু বললেন, আজীবন বিজ্ঞানচর্চা করছি, কিন্তু এমন উদ্ভট কল্পনার কথা কখনও মনেও আসেনি! এ কল্পনার যুক্তি আছে বটে, কিন্তু সে যেন রূপকথার যুক্তি!

কমল বললে, আমাদের মধ্যে বাঘাই সুখী! রামদাস আমাদের বোট ঘাড়ে করতে-না করতেই সে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে বেঁচে গেছে!

রামহরি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, আহা, সে কি আর বেঁচে আছে?

কুমার বললে, আমারও তাই মনে হচ্ছে। শত বিপদেও বাঘা কখনও আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। বেঁচে থাকলে নিশ্চয় সে রামদাসের পিছনে পিছনেই আসত।

-- --

বাঘার কি হল সেটা আমাদের দেখা দরকার। বিমল ও কুমারের সমস্ত ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তারাই জানেন, বাঘা সাধারণ কুকুর নয়। পশুর মাথায় মানুষের মস্তিষ্ক ঢুকিয়ে ধরণী। নতুন পরীক্ষা করতে চায়, কিন্তু পশুর মস্তিষ্কে যে খানিকটা মানুষি বুদ্ধি থাকতে পারে, অনেক কুকুরই অনেকবার তার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়েছে। বাঘাও হচ্ছে সেই জাতীয় কুকুর।

হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই বাঘা যখন দেখলে, জলের নৌকো আকাশে উড়ছে, তখন তার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। এমন অস্বাভাবিক কাণ্ড কোন কুকুর কবে দেখেছে? ভয়ে তার আর দিগবিদিক জ্ঞান রইল না, বিকট চিৎকার করে এক লাফে সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

জলে পড়ে সাঁতার কাটতে কাটতে সে দেখলে খানিক তফাতেই একটা তালগাছ সমান উঁচু ছায়ামূর্তি কোমর-জল ভেঙে ডাঙার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু সেই দানবমূর্তি দেখেও বাঘা বিশেষ বিস্মিত হল না। কারণ বিমল ও কুমারের সঙ্গে গিয়ে হিমালয়ের ভয়ঙ্কর-দেরও সে দেখে এসেছে, তার চক্ষে দানব-মূর্তি এখন আর অস্বাভাবিক নয়! সে খালি এইটুকুই বুঝে নিলে যে, ওই দানবের কাছ থেকে যত তফাতে থাকা যায় ততই ভালো।

এমন সময়ে আর একদিকে তার নজর পড়ল। জলের ওপরে আবছা আলোর ভেতরে যেন খানিকটা নিরেট অন্ধকার জমাট হয়ে আছে! খালি তাই নয়, অন্ধকারের এক জায়গায় যেন দু-টুকরো আগুনের মতো কি জুলজুল করছে।

সে অন্ধকার আর কিছুই নয়, মস্তবড় একটা কুমির।

এই জলচর জীবটিও বাঘার চোখে নতুন নয়! জলে এর সঙ্গে লড়াই হলে তারই যে সমধিক বিপদের সম্ভাবনা এটাও সে বুঝতে পারলে।

কুমির হঠাৎ বললে, ঘোঁ-ঘটঘট ঘোঁ-ঘট-ঘট, ঘোঁ-ঘট-ঘট! দে চম্পট দে চম্পট দে চম্পট!

হতভম্ব বাঘার দুই কান খাড়া হয়ে উঠল! সে মানুষের ভাষায় কথা কইতে পারে না বটে, কিন্তু শুনলে মানুষের ভাষা বুঝতে পারে। এই কুমিরটার কথা যে মানুষের কথার মতন শোনাচ্ছে!

কিন্তু এ-সব কথা নিয়ে এখন সময় নষ্ট করবার সময় নেই। সে নিজের দেহ দিয়ে। কোনও ক্ষুধার্ত জলচরের উপবাসভঙ্গ করতে মোটেই রাজি নয়! অতএব বাঘা তাড়াতাড়ি সাঁতার কেটে অনেক দূরে চলে গেল।

কিন্তু কুমিরটা তাকে একবারও আক্রমণ করবার চেষ্টা করলে না।

বাঘা তখন আবার ডাঙার দিকে ফিরল। তখন আবার সেই ছায়া-দানবের কথা তার মনে পড়ল। কিন্তু কোথায় গেল সে? কোনওদিকেই তাকিয়ে বাঘা তাকে আবিষ্কার করতে পারলে না।

বোট যে কেন আকাশে উড়েছিল, সে এখন তা বুঝতে পেরেছে। দানবের মাথায় বোটের ভেতরেই যে তার মনিবরা আছেন, এও সে জানে। এখন সে অনায়াসেই পুলিশের ইস্টিমারে উঠে নিজে নিরাপদ হতে পারত, কিন্তু সে কথা একবারও তার মনে হল না। বাঘা যে-জাতের জীব, সে-জাত প্রাণের চেয়েও বড় মনে করে মনিবকে। অতএব সে সাঁতার কেটে ডাঙায় গিয়ে উঠল,কারণ তার দৃঢ়বিশ্বাস হল যে, মনিবরা দানবের মাথায় চড়ে ওই দ্বীপেই গিয়েছেন।

কিন্তু দ্বীপে উঠে হল আর এক মুশকিল। দানবটা কোনদিকে গিয়েছে? চারদিকেই গভীর জঙ্গল, কোনদিকে যাওয়া উচিত?

মানুষ হলে বাঘাকে এখন হতাশ হতে হত। কিন্তু সে হচ্ছে কুকুর, তার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি আছে, তাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। রামদাস যখন বোট শূন্যে তুলেছিল, তখনি তার গায়ের বিশেষ গন্ধ বাঘার নাকে এসেছিল। সে এখন চারিদিকের মাটি শুঁকে-শুকে রামদাসের গায়ের গন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টায় লেগে গেল।

ভোর হল। সূর্য উঠল। গাছের মাথায়-মাথায় রোদের আলপনা। বাঘা তখনও ব্যস্ত হয়ে মাটি শুঁকে-শুঁকে বেড়াচ্ছে!

আরও কতক্ষণ পরে এক জায়গায় বড়-বড় কয়েকটা পায়ের দাগ দেখা গেল। সেইখানে নাক বাড়িয়েই বাঘা আনন্দে অস্ফুটকণ্ঠে ডেকে উঠল! এতক্ষণে সেই গন্ধ পাওয়া গেছে।

আর কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না! মহা খুশি হয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বাঘা মাটিতে নাক রেখে অগ্রসর হল।

কখনও খোলা জমির ওপর দিয়ে এবং কখনও ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অনেকক্ষণ পথ চলে বাঘা শেষটা এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির পাশে তাদের সেই মোটরবোটখানা কাত হয়ে পড়ে আছে!

বাঘা দৌড়ে গিয়ে বোটে উঠল। কামরার ভেতরে ঢুকল। সেখানে তার মনিবদের জিনিসপত্তর ও বন্দুকগুলো এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু তার মনিবরা কোথায়?

কামরা থেকে বেরিয়ে এসে বাঘা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, এমন সময়ে হঠাৎ একটা দাড়িওয়ালা লোক ঠিক যেন মাটি খুঁড়ে ওপরে উঠে এল।

এ-লোকটাকে বাঘা আগেও দেখেছে এবং তার কুকুর-বুদ্ধি বললে, এ তাদের বন্ধুলোক নয়। সে চটপট আবার কামরার ভেতরে গা-ঢাকা দিলে।

খানিক পরে সাবধানে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, সেই সন্দেহজনক লোকটা অদৃশ্য হয়েছে।

তখন অমন-হঠাৎ লোকটা কেমন করে আবির্ভূত হল তার তদারক করবার জন্যে কৌতূহলী বাঘা খুব সন্তর্পণে এগিয়ে গেল।

ঝোপের মধ্যে কতকগুলো ডালপাতা রাশিকৃত হয়ে রয়েছে এবং তারই ফাঁক দিয়ে একসার সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে! ঝোপের বাহির থেকে এ-সব কিছুই দেখা যায় না এবং ঝোপের ভেতরে এসে দাঁড়ালেও সহজে সেই সিঁড়ির সার আবিষ্কার করা যায় না।

বাঘা সেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল! তারপরেই তার কানে এল পরিচিত কণ্ঠস্বর! বাঘার খুশি-ল্যাজ তখনি বেজায় ব্যস্ত হয়ে উঠল!

আনন্দে বিহ্বল হয়ে বাঘা সর্বপ্রথমে কুমারের ভূতলশায়ী দেহের ওপরে গিয়ে আঁপিয়ে পড়ল এবং আদর করে তার গা চেটে দিতে লাগল।

রামহরি বিষাদ ভরা গলায় বললে, কেন বাঘা মরতে এলি এখানে? আমরা মরব, তুইও মরবি।

বিমল কিন্তু বিপুল উৎসাহে বলে উঠল, না, না! আমরাও বাঁচব, বাঘাও বাঁচবে! ভগবান এখনও বোধহয় আমাদের স্বর্গের টিকিট দিতে রাজি নন! বাঘা সেই খবরই নিয়ে এসেছে।

বিনয়বাবু ম্লান মুখেই বললেন, বিমল, হঠাৎ তোমার এতটা খুশি হওয়ার কারণ বুঝলুম না!

বুঝলেন না? কিন্তু আমি বুঝছি বাঘা যখন এসেছে, তখন ধরণীর ছুরি থেকে নিশ্চয়ই আমাদের মাথা বাঁচাতে পারব! মরি তো একেবারেই মরব, কিন্তু মাসিকপত্রের ওই দুই কবির মতো কুমির কি হনুমান হয়ে থাকব না!

কমল বললে, আমাদের হাত-পা দুইই বাঁধা, ধরণী আমাদের নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে!

কুমার বললে, না, তা আর পারে না! বিমল কি বলছে আমি বুঝেছি। বাঘা! – বলেই সে বাঘার মুখের কাছে নিজের বাঁধা হাতদুটো কোনওরকমে এগিয়ে দিলে।

বাঘা প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল।

কুমার তখন বাঘার মুখের ওপরে নিজের হাতদুটো ঘষতে ঘষতে বললে, ওকি রে বাঘা, তুই আমার ইশারা বুঝতে পারছিস না? নে, নে, দড়ি কাট!

বাঘার আর কোনও সন্দেহ রইল না। সে তখনি নিজের ধারালো দাঁত দিয়ে কুমারের হাতের দড়ি চেপে ধরলে। দেখতে-দেখতে তার হাতের দড়ি খসে পড়ল! কুমার তখন আগে নিজেই নিজের পায়ের বাঁধন খুলে ফেললে! এবং তারপর একে একে সকলেরই বন্ধনদশা ঘুচতে আর দেরি লাগল না!

বিমল বাঘাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, ওরে বাঘা, বাঘা রে! গেল-জন্মে তুই আমাদের কে ছিলি রে বাঘা? বাঘাও সুখে যেন গলে গিয়ে বিমলের কোলের ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে দিলে!

বিনয়বাবু বললেন,ওঠো বিমল, পরে বাঘাকে ধন্যবাদ দেওয়ার অনেক সময় পাবে!

বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, ঠিক বলেছেন! আগে এই পাতালপুরী থেকে বেরুতে না পারলে নিস্তার নেই! এসো সবাই! কিন্তু খুব ধীরে আর খুব হুঁশিয়ার হয়ে!

একে-একে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলে যেখানটাকে তারা এতক্ষণে উঠান বলে মনে করছিল, সেখানে রয়েছে মস্ত বড় একটা জলের ইঁদারা!

বিমল চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বললে, বিনয়বাবু, এই পাতালপুরীটা কি রকম তা বুঝেছেন? লখনউ-এর নবাবরা গরমের সময়ে মাটির নীচে ঘর তৈরি করে বাস করতেন। সেই আদর্শেই এটা তৈরি হয়েছে। বর্ধমানেও এইরকম পাতালপুরী আছে। বিপদের সময়ে লুকোবার জন্যেই ধরণী এটা বোধহয় তৈরি করেছে!

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই হো-হো-হো-হো করে একটা বিষম অট্টহাসি সেই পাতালপুরীর ভেতরে প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুললে। বিমল সচমকে মুখ তুলে দেখলে, সিঁড়ির ওপরকার ধাপে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছে ধরণী!

ধরণী হঠাৎ হাসি থামিয়ে নিষ্ঠুর স্বরে বললে, এই যে, দড়িটড়ি সব বুঝি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে?

বিমল দুই পা এগিয়ে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ! আমরা মানুষ, দড়ি বাঁধা থাকতে ভালো লাগল না!

ধরণী দুই পা পিছিয়ে ব্যঙ্গের স্বরে বললে, ও! এখনও তোমরা মানুষই বটে! কিন্তু ভয় নেই, তোমাদের মনুষ্যদেহ আর বেশিক্ষণ থাকবে না!

বিমল সিঁড়ির ওপরে এক ধাপ উঠে বললে, আজ্ঞে না, এখনও আমাদের নরদেহ ত্যাগ করবার ইচ্ছা হয়নি।

ধরণী গর্জে উঠে বললে, খবরদার! আর এক পা এগিয়ে না! ভাবছ এখান থেকে বেরুতে পারলেই বাঁচবে? জানেনা, বাইরে কে পাহারা দিচ্ছে?

রামদাস।

হ্যাঁ, এখান থেকে এক পা বেরুলেই সে তোমাদের পায়ের কড়ে আঙুলে টিপে বধ করবে!

বেশ, সেইটেই একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক বলেই বিমল দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল এবং তার পিছনে- পিছনে আর সকলেও!

বিমলের ইচ্ছা ছিল, ধরণীকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তার অভিপ্রায় বুঝে ধরণী এক মুহূর্তেই তিন লাফ মেরে বাইরে বেরিয়ে গেল!

তারাও তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে দেখলে ধরণী তীরবেগে ছুটছে এবং প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকছে–রামদাস! রামদাস! রামদাস!

ঝোঁপের বাইরে একটুখানি ঘাসজমি এবং তারপরেই নিবিড় অরণ্য যেন দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ধরণী সেই অরণ্যের ভেতরে মিলিয়ে গেল।

বিনয়বাবু ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, এখন আমরা কোনদিকে যাব?

কুমার বললে, আমাদের আর কোনওদিকে যেতে হবে না। ওই দেখুন!

অরণ্যের এক অংশ আচম্বিতে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছে–মড়মড় করে বড়-বড় ডালপালা ভেঙে পড়ার এবং মাটির ওপরে ধুপ-ধুপ করে আশ্চর্য পায়ের শব্দ!

তারপরেই এক অতি ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠস্বর, রামদাস, রামদাস! ওই পোকাগুলোকে পায়ে। থেঁতলে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দাও!

বিমল মৃদু হেসে বললে, এইবারে রামদাসকে আমরা স্বচক্ষে দেখব!

.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। কবির আবির্ভাব

রামদাস,-ছোট্ট হরিদাসের মস্ত ভাই রামদাস, ধরণীর সৃষ্টিছাড়া পরীক্ষার জ্যান্ত ফল রামদাস-, যার পায়ের তলে পৃথিবী টলে, যার হাতের জোরে মানুষ-ভরা মোটরবোট জল ছেড়ে শুন্যে ওড়ে, যার মাথা দোলে বুড়ো তালগাছের মাথার সমান উঁচু হয়ে ঝড়ের হুহুঙ্কারে!

সেই রামদাস আসছে আজ বিমলদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, ধরণীর নিষ্ঠুর হুকুম পালন করবার জন্যে, এক-এক বিরাট পায়ের চাপে পাঁচ-পাঁচটি ক্ষুদ্র মানুষের দেহ ঠুনকো কাচের পেয়ালার মতো চূর্ণ করবার জন্যে!

সকলে অত্যন্ত অসহায়ের মতো এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগল, কিন্তু কোথায় পালাবার পথ? সামনে খোলা জমি, তারপরেই দুর্ভেদ্য বন, যার ভেতর দিয়ে মড়মড় করে বড়-বড় ডালপালা ভাঙতে-ভাঙতে আসছে স্বয়ং রামদাস, বামপাশে ও ডানপাশেও নিবিড় অরণ্য যেন নিরেট প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে হয়তো তার ভেতরেও তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে সেই হাতির মতো ডালকুত্তা এবং সেখানে গিয়ে পথ খোঁজবারও সময় নেই!

বিনয়বাবু বললেন, বিমল, আমাদের আবার সেই পাতালপুরীতেই ফিরে গিয়ে বন্দি হতে হবে রামদাস তার ভেতরে ঢুকতে পারবে না!

দাঁতে দাঁত চেপে বিমল বললে, সেখানে গিয়ে ধরণীর ছুরিতে মস্তিষ্ক দান করব? প্রাণ থাকতে নয়!

বিনয়বাবু বললেন, কিন্তু এখানেই প্রাণ আর থাকছে কই?

কুমার বললে, রামদাসের সঙ্গে লড়তে-লড়তে আমি প্রাণ দিতেও রাজি আছি, কিন্তু ধরণীর ছুরিতে মস্তিষ্ক দিয়ে মরেও বেঁচে থাকতে পারব না!

কমল বললে, আমারও ওই মত!

রামহরি কেবল কাঁদতে লাগল।

কিন্তু বাঘা চাঁচাচ্ছে শুধু ঘেউ-ঘেউ করে–সে বোধহয় রামদাসকে শুনিয়ে-শুনিয়ে কুকুর ভাষায় সবচেয়ে খারাপ গালাগালিগুলো বষর্ণ করছে!

হঠাৎ কমল বলে উঠল, বিমলবাবু, দেখুন–দেখুন!

সকলে মুখ ফিরিয়ে দেখলে, ডানদিকের একটা বড় গাছের ওপর থেকে থেকে তাড়াতাড়ি নেমে আসছে মস্ত একটা হনুমান! নীচের ডাল থেকে সে এক লাফে ভূতলে অবতীর্ণ হল এবং তারপর দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাত নেড়ে ব্যস্তভাবে সবাইকে ডাকতে লাগল।

বিনয়বাবু সবিস্ময়ে বললেন, ও কী ব্যাপার?

বিমল বললে, বোধহয় সেই হনুমানযার মাথায় বেঁচে আছে মানুষের মগজ!

কুমার বললে, ও যে আমাদের ডাকছে!

বনের ডালপালা ভাঙার শব্দ তখন খুব কাছে এসে পড়েছে রামদাসের দেখা পেতে বোধহয় আর আধ মিনিটও দেরি লাগবে না!

বিমল বললে, ধরণীর কথা যদি সত্য হয়, তাহলে ওই পশুদেহের ভেতরে আছে মানুষেরই মন! চলো সবাই, প্রাণ তো গিয়েছেই, এখন ওর কথা শুনে কি হয় সেইটেই দেখা যাক!

বাঘা গরর-গরর করে এগিয়ে যাচ্ছিল হনুমানজিকে নিজের বীরত্ব দেখিয়ে বাহাদুরি নেওয়ার জন্যে; কিন্তু কুমারের কাছ থেকে এক চড় খেয়ে সে ল্যাজ গুটিয়ে সকলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল কিন্তু বুঝতে পারলে না যে, হনুমানের মতো একটা জানোয়ারকে কামড়াতে যাওয়াটা আজ হঠাৎ অপরাধ হয়ে দাঁড়াল কেন?

তারা সবাই হনুমানের দিকে অগ্রসর হল, হনুমানও গিয়ে দাঁড়াল একেবারে অরণ্যের ধার ঘেঁষে একটা ঝোপের পাশে। তারপর কি আশ্চর্য, সে ঠিক মানুষেরই মতো ঝোপের দিকে হাত তুলে আঙুল দিয়ে কি ইঙ্গিত করলে!

কিন্তু বিমলদের তখন অসম্ভব ব্যাপার দেখে বিস্মিত হওয়ার অবকাশ ছিল না, তারা তাড়াতাড়ি যখন সেই ঝোপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল হনুমান তখন লাফ মেরে একটা গাছে উঠে আবার কোথায় অদৃশ্য হয়েছে।

ঝোপের পিছনেই প্রায়-নিরেট বনের তলায় একটা অন্ধকার মাখা পায়ে-চলা সরু পথ।

বিমল মহাখুশি হয়ে বলে উঠল, হনুমান আমাদের পথ দেখিয়ে দিলে! জয় হনুমান!

সকলে সেই পথ ধরে যখন বনের ভেতরে প্রবেশ করলে তখন তাদের মনে হল, যেন পৃথিবীর সমস্ত আলো চোখের সুমুখে সুইচ টিপে কে নিবিয়ে দিলে! সে-অরণ্য এমনি নিবিড় যে, তার ভেতরে রোদ বা জ্যোৎসা কোনওদিন বেড়াতে আসতে পারেনি!

অন্ধকার যখন একটু চোখ-সওয়া হয়ে এল, তখন তারা চারিদিক হাতড়াতে-হাতড়াতে কোনওগতিকে গুঁড়ি মেরে আস্তে-আস্তে এগুতে লাগল।

সেই সময়ে পিছন থেকে ভেসে এল যেন গম্ভীর মেঘগর্জন!

বিনয়বাবু বললেন, আমাদের দেখতে না পেয়ে রামদাস বোধহয় ক্ষাপ্পা হয়ে গর্জন করছে!

সকলে সেই অবস্থাতে যথাসম্ভব পায়ের গতি বাড়িয়ে দিলে! সৌভাগ্যের বিষয়, এই চির-অন্ধকারের রাজ্য দিয়ে তাদের আর বেশিক্ষণ যেতে হল না, অরণ্যের নিবিড়তা ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল এবং আলোকের আভাসে বনের ভেতরটা ক্রমেই বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে অরণ্য শেষ হয়ে গেল, তারা আবার একটা বড় মাঠের ওপরে এসে দাঁড়াল।

সারা আকাশ তখন প্রখর রৌদ্রে সমুজ্জ্বল, ময়দানের নীলিমার ওপর দিয়ে সোনালির স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

বিমল একটি সুদীর্ঘ আঃ উচ্চারণ করে যেন সেই নির্মল আলোক আর প্রমুক্ত বাতাসকে দৃষ্টি আর নিশ্বাস দিয়ে নিজের বুকের ভেতরে টেনে নিতে লাগল!

কুমার বললে, এখনও আঃ বলে নিশ্চিন্তে আরাম করবার সময় হয়নি বিমল! রামদাস গোটাকয় লাফ মারলেই এখানে এসে হাজির হতে পারবে!

বিমল বললে, ঠিক! খোলা মাঠ পেয়েছি, চলো এইবার আমরা দৌড়ই!

কমল বললে, কিন্তু কোনদিকে যাব?

কুমার বললে, কোনদিকে আবার! আমরা এসেছি পূর্বদিক থেকে, আমাদের যেতেও হবে পূর্বদিকে!

সবাই পূর্বদিকে ছুটতে শুরু করলে। ছুটাছুটিতে বাঘার ভারী আমোদ! সে ভাবলে এইবারে খেলার পালা শুরু হল! তখনি সে ভালো করেই দেখিয়ে দিলে যে ছুটাছুটি খেলায় তাকে হারিয়ে কেউ ফার্স্ট প্রাইজ নিতে পারবে না।

ময়দানের ওপারে আবার একটা বনের আরম্ভ,–এ বন তেমন ঘন নয়।

কিন্তু সকলে এখানে এসেই সভয়ে শুনলে, বনের ভেতর দিয়ে কারা তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে!

শত্রুরা কি তাদের ইস্টিমারে যাওয়ার পথ বন্ধ করে আক্রমণ করতে আসছে?

পিছনে আছে রামদাস, আর এদিকে আছে কে! সশস্ত্র ধরণী, হরিদাস–আর সেই হাতির মতো ডালকুত্তা?

তাহলে উপায়? তারা নিরস্ত্র, বাধা দেওয়ার কোনও উপায়ই নেই! এক উপায়, পালানো। কিন্তু এবারে তারা কোনদিকে পালাবে?

কুমার হঠাৎ প্রচণ্ড উৎসাহে বলে উঠল, পুলিশ! পুলিশ! মিলিটারি পুলিশ!

বিমল চকিতে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলে, বনের ভেতর থেকে সার বেঁধে সমতালে পা ফেলে মিলিটারি পুলিশের লোক বেরিয়ে আসছে।

সে সানন্দে বললে, আর আমাদের কোনও ভয় নেই! বিনয়বাবু, ওই দেখুন বন্দুকধারী পুলিশ ফৌজ, ওই দেখুন মেশিনগান! আসুক এখন রামদাস, আসুক এখন ধরণী আর আসুক তার হাতি-কুকুর!

ইনস্পেকটর তাদের দেখে দৌড়ে এসে বললেন, বিমলবাবু, ব্যাপার কী? মোটরবোট শুদ্ধ কোথায় উধাও হয়েছিলেন?

বিমল বললে, আমরা যমালয়-ফেরত মানুষ!

তার মানে?

তার মানে তালগাছের মতন উঁচু দৈত্য মোটরবোট শুদ্ধ আমাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল!

কী যে আপনি বলেন!

বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে শুনুন।

বিমল তাড়াতাড়ি খুব অল্প কথায় মোটামুটি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে।

ইনস্পেক্টার সব শুনে খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। এ যে গাঁজাখুরি কথার মতো শোনাচ্ছে।

বিশ্বাস করুন মশায়, বিশ্বাস করুন! গাঁজার ধোঁয়া যেমন সত্য, আমাদের কথাও তেমনি সত্য!

আপনারা স্বপ্ন বা ম্যাজিক দেখেছেন কিনা জানি না, কিন্তু আপনারা যে বিপদে পড়েছেন, এটা আমি আন্দাজ করেছিলুম। তাই তো লোকজন নিয়ে আমি আপনাদের খুঁজতে বেরিয়েছি।

বড় ভালো কাজ করেছেন মশাই, বড় ভালো কাজ করেছেন। আমাদের তো খুঁজে পেয়েছেন, এইবারে চলুন সেই রামদাসের খোঁজে!

নিশ্চয়ই যাব! কিন্তু ওই যে বললেন, আপনাদের এই রামদাসের গল্প গাঁজার ধোঁয়ার মতন সত্য, শেষটা গাঁজার ধোঁয়ার মতোই রামদাস উপে যাবে না তো?

কুমার বললে, হুঁ! রামদাস উপে যাওয়ারই ছেলে বটে! ওই দেখুন, মাঠের পারের ওই বনে দাঁড়িয়ে রামদাস আমাদেরই দেখছে!

ইনস্পেকটর সেইদিকে তাকিয়েই চমকে মস্ত এক লাফ মারলেন!

ময়দানের ওদিককার বনের সারের ওপরে এক মানুষ-তালগাছ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলকে লক্ষ করছে, দুই হাত দুই কোমরে রেখে! তার অদ্ভুত দেহের তুলনায় বড়-বড় তালগাছগুলোকেও ছোট দেখাচ্ছে! এতদূর থেকে তার মুখের ভাব দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু সেটা যে বিপুলবপু এক নরদৈত্যের মূর্তি, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই!

মিলিটারি পুলিশের দলের ভেতর থেকে একটা বিস্মিত কোলাহল-ধ্বনি উঠল!

বিমল বললে, কিন্তু সেই হাতির মতো ডালকুত্তা! সে এখনও একবারও দেখা দিলে না কেন?

ইনস্পেকটর বললেন, রক্ষে করুন মশায়, আর আমি তাকে দেখতে চাই না! যা দেখছি, তাতেই পিলে চমকে উঠেছে! এই সেপাই, ফায়ার করো–ফায়ার করো!

বিমল ব্যস্তভাবে বললে, না না! আগে দেখাই যাক, রামদাসকে আমরা জ্যান্ত অবস্থায় গ্রেপ্তার করতে পারি কিনা!

ইনস্পেকটর দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতো করে তুলে সবিস্ময়ে বললেন, গ্রেপ্তার! ওকে গ্রেপ্তার করতে চায় কে? ওর কাছে গেলে ও তো পুঁটিমাছের মতো টপ-টপ করে আমাদের মুখে ফেলে দেবে! ওর হাতে পরাবার হাতকড়িই বা কোথায় পাব? ইস্টিমারে ওর দেহ কুলোবে না, নিয়ে যাব কেমন করে! না-না, গ্রেপ্তার-ট্রেপ্তার নয়, ওকে একেবার বধ করতে হবে!

বিমল বললে, কিন্তু এত দূর থেকে গুলি ছুড়লে তো ওর গায়ে লাগবে না!

তবু বন্দুক ছুড়ক! বন্দুকের শব্দে ভয় পেয়ে দৈত্য-বেটা এখান থেকে পালিয়ে যাক। ওকে দেখতে আমার একটুও ভালো লাগছে না! এই সেপাই! বন্দুক ছোঁড়ো–মেশিনগান ছোড়ো!

বন্দুক ও কলে কামানের ঘন-ঘন বজ্র-গর্জনে চতুর্দিক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল! এবং সঙ্গে-সঙ্গে রামদাসের দেহ বনের ভেতরে ডুব মারলে! তাহলে আগ্নেয়াস্ত্রের শক্তি সে জানে!

ইনস্পেকটর উৎসাহ ভরে বলে উঠলেন, দেখছি দৈত্য-বেটা গোঁয়ারগোবিন্দ নয়! তবে চলো সবাই অগ্রসর হই! কিন্তু খবরদার, বন্দুক-ছোঁড়া বন্ধ কোরো না! সেই ফাঁকে দৈত্যটা কাছে এসে পড়লে আর রক্ষে নেই!

সকলে মিলে অগ্রসর হল–যেখানটায় রামদাসকে দেখা গিয়েছিল সেইদিকে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে রামদাসের বদলে পাওয়া গেল ধরণীকে! একটা গাছের তলায় ধরণী লম্বা হয়ে শুয়ে আছে বন্দুকের গুলি লেগে তার কপাল বয়ে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে!

বিমল তার বুকে হাত দিয়ে দেখে বললে, ধরণী এ-জীবনে আর আমাদের মগজ নিয়ে পরীক্ষা করতে পারবে না।

তারপর আবার রামদাসের সন্ধান আরম্ভ হল। কিন্তু দ্বীপের চারিদিক, ছোট-বড় সমস্ত বন খুঁজেও তার কোনওই পাত্তা পাওয়া গেল না।

সবাই যখন দ্বীপের ওপাশে আবার নদীর ধারে এসে পড়ল, বিনয়বাবু তখন একদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

আগেই বলা হয়েছে নদী এখানে প্রায় সমুদ্রের মতন দেখতে! সেই বিশাল জলের রাজ্যে দেখা গেল, বহুদুরে দুটো বড়-বড় জীব সাঁতার কেটে কোথায় ভেসে চলেছে!

বিমল বললে, নিশ্চয়ই ওরা হচ্ছে রামদাস আর সেই বিরাট কুকুর।

কিন্তু রামদাসের দাদা হরিদাসটা গেল কোথায়?

হয়তো রামদাসের চওড়া পিঠে বসে নদী পার হচ্ছে। কি বলেন ইনস্পেকটর মশাই, ইস্টিমারে চড়ে আবার ওদের তাড়া করব নাকি?

ইনস্পেকটর বললেন, আপদ যখন নিজেই বিদেয় হয়েছে, তখন আর হাঙ্গাম করে দরকার কি? কিসে কি হয় বলা তো যায় না, ও বেটা যদি ডুবসাঁতার দিয়ে এসে ছুঁ মেরে ইস্টিমারের তলা ফাটিয়ে দেয়?

সকলে যখন বনের ভেতর দিয়ে আবার ফিরে আসছে, তখন মাথার ওপরকার একটা গাছের ডাল-পাতা হঠাৎ নড়ে উঠল, তারপর শোনা গেল-কিচির কিচির মিচির-কিচির-মিচির কিচকিচ-কিচকিচ!

মানুষ আমি নইকো রে ভাই,
আজকে আমি মানুষ নই,
তোমরা সবাই চললে দেশে,
একলা আমি হেথায় রই।
আমার দেশের সবুজ মাঠে
ধানের খেতে সোনার দোল,
বইছে নদীর রূপোর লহর,
শিউলি ঝরা মাটির কোল!

সে করুণ স্বর শুনে সকলেরই মন ব্যথায় ভরে উঠল।

বিনয়বাবু ওপর দিকে মুখ তুলে মমতা-ভরা কণ্ঠে বললেন, কবি, আজ তোমার চেহারা যেরকমই হোক, তুমি আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছ! তুমি গাছ থেকে নেমে এসো, আমাদের সঙ্গে আবার দেশে ফিরে চলো।

গাছের ওপর থেকে আবার সেই দুঃখমাখা কণ্ঠ শোনা গেলঃ

আমার ঘরের মিষ্টি বধূ

ডাকছে আমায় রাত্রি-দিন,
আমার খোকার, আমার খুকির
কণ্ঠে বাজে স্বপ্ন-বীণ।
কেমন করে ফিরব ঘরে,
আজকে আমি মানুষ নই,
তোমরা সবাই চললে দেশে,
একলা আমি হেথায় রই!